

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা সুলতানা বুশরাহ্

রোলঃ ২১৫০০৪৩০

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা সুলতানা বুশরাহ্
রোলঃ ২১৫০০৪৩০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সীরাহ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা সুলতানা বুশরাহ, আইডিঃ ২১৫০০৪৩০ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

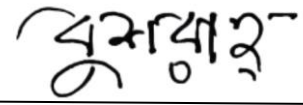
ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফাহিমা সুলতানা বুশরাহ্

আইডিঃ ২১৫০০৪৩০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৮
১. সীরাহ কী?	৯
২. সীরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব	৯
৩. নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব	১১
৩.১ প্রাক ইসলামী যুগে আরব সম্প্রদায়	১১
৩.২ প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের ধর্ম	১২
৩.৩ যমযম কূপের উদ্ভব	১৩
৩.৪ যমযম কূপের পুনরুদ্ধার	১৪
৩.৫ আবরাহার হস্তী বাহিনী	১৫
৪. রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আবির্ভাব	১৬
৪.১ জন্ম	১৬
৪.২ দুধপান ও শৈশব	১৭
৪.৩ বক্ষ বিদারণ	১৮
৪.৪ আমিনার মৃত্যু এবং দাদার কোলে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ	১৯
৪.৫ স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে	১৯
৪.৬ জাযিরার বাহিরে গমন	২০
৪.৭ হিলফুল ফুযূল	২০
৪.৮ খাদিজা রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ	২১
৪.৯ কা'বা পুনর্নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন	২৩
৪.১০ মেঘপালন— সকল নবীর পেশা	২৪
৫. রাসূল সাঃ এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	২৫
৬. নবুওয়াতপ্রাপ্তি	২৬
৬.১ হেরা গুহার অভ্যন্তরে	২৭
৬.২ ইকরা - পড়ে	২৮
৭. দাওয়াহ এবং প্রতিক্রিয়া	৩০
৭.১ প্রথম পর্যায় : গোপনে ইসলাম প্রচার	৩০

৭.২ অগ্রগামী মুসলিমগণ	৩১
৭.৩ দারুল আরকামে জমায়েত	৩১
৭.৪ দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আহ্বান	৩২
৭.৫ সাফা পর্বতের উপর	৩৪
৭.৬ হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত	৩৭
৭.৭ প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার প্রতিক্রিয়া	৩৮
৭.৮ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান	৪৪
৭.৯ আবু তালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল	৪৪
৮. আবিসিনিয়ারর পথে	৪৬
৮.১ প্রথম হিজরত	৪৬
৮.২ কাফিরদের সিজদাহ	৪৭
৮.৩ দ্বিতীয় হিজরত	৪৮
৮.৪ মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	৪৮
৮.৫ হত্যার ষড়যন্ত্র	৫০
৯. বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ	৫০
১০. বয়কট	৫১
১১. শোকের বছর	৫১
১২. তায়েফের ঘটনাবলী	৫৫
১৩. ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	৫৮
১৪. আয়িশাহ রাঃ -এর সাথে বিবাহ	৫৯
১৫. ইসরা ও মিরাজ	৫৯
১৬. ইসলামের দুর্গঃ আল আনসার	৬৩
১৬.১ আকাবার প্রথম বাইয়াত	৬৩
১৬.২ মুসআব বিন উমাইরের প্রতিনিধিত্ব	৬৩
১৬.৩ আকাবার দ্বিতীয় বাইআত	৬৪
১৭. ইয়াসরিব হলো মদীনা	৬৬
১৮. নতুন ভূমির সন্ধানে : হিজরত	৬৯
১৮.১ দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের অধিবেশন	৬৯

১৮.২ হিজরতের অনুমতি	৭০
১৮.৩ রাসূল সাঃ -এর গৃহত্যাগ	৭১
১৮.৪ কুরাইশদের প্রচেষ্টা	৭১
১৮.৫ মদীনার পথে	৭২
১৮.৬ মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাঃ	৭৩
১৮.৭ মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ	৭৪
১৯. মদীনার জীবন : দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ	৭৫
২০. তৎকালীন মদীনার অবস্থা	৭৬
২১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা	৭৮
২১.১ ধর্মীয় প্রোজেক্ট	৭৮
২১.২ সামাজিক প্রোজেক্ট	৮২
২১.৩ রাজনৈতিক প্রোজেক্ট	৮৩
২১.৪ সামরিক প্রোজেক্ট	৮৬
২২. ইহুদীদের সাথে চুক্তি	৮৭
২৩. কুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচি	৮৮
২৪. যুদ্ধের অনুমতি	৮৯
২৫. সামরিক অভিযানের শুরু	৯০
২৬. কিবলার পরিবর্তন	৯১
২৭. বদরের যুদ্ধ	৯২
২৮. বদর যুদ্ধ পরবর্তী বিচ্ছিন্ন ঘটনা	১০১
২৮.১ বনু কাইনুকা অভিযান	১০২
২৮.২ কথার যুদ্ধ, মিডিয়ায় যুদ্ধ	১০৩
২৮.৩ বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক ঘটনা	১০৩
২৮.৪ সাহাবীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক	১০৪
২৯. উহুদের যুদ্ধ	১০৪
৩০. উহুদ থেকে খন্দক	১০৮
৩১. খন্দকের যুদ্ধ	১১৩
৩২. বনু কুরাইযার অভিযান	১১৫

৩৩. খন্দক থেকে হুদাইবিয়া	১১৫
৩৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি	১১৬
৩৫. হুদায়বিয়া থেকে খাইবার	১১৮
৩৬. খাইবারের যুদ্ধ	১১৮
৩৭. কাযা উমরা	১২০
৩৮. মু'তাহর যুদ্ধ	১২১
৩৯. মক্কা বিজয়	১২৩
৪০. হুনাইনের যুদ্ধ	১২৭
৪১. তাবুক যুদ্ধ	১২৮
৪১.১ প্রেক্ষাপট	১২৮
৪১.২ মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি	১২৯
৪১.৩ যুদ্ধের ময়দানে	১২৯
৪১.৪ মদীনায় প্রত্যাবর্তন	১৩০
৪২. বিদায় হজ্জ	১৩২
৪৩. সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান	১৩৯
৪৩.১ অসুস্থতার সূচনা	১৪০
৪৩.২ শেষ সপ্তাহ	১৪১
৪৩.৩ পবিত্র জীবনের শেষদিন	১৪৫
৪৩.৪ ফীর রফীকুল আ'লা	১৪৭
৪৩.৫ বিষাদময় দিন	১৪৮
৪৩.৬ কাফন-দাফন	১৫০
শেষ কথা	১৫২
তথ্যসূত্র	১৫৩

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য এই বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা নিয়ে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাঃ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাঁকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ।

আল্লাহ তা'আলা এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। আমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে ভালোবাসার দাবী করি ঠিকই কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি না। এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে জানা। আর জানার উপায় হচ্ছে তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন পুরো জগৎবাসীর জন্য রহমত ও হিদায়াতরূপে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।”

[সূরা আল আশ্বিয়া : ১০৭]

রাসূলুল্লাহ সাঃ : এক অনুপম জীবনাদর্শ

১. সীরাহ কি?

সীরাহ [سِيرَة] শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে জানা হয়, ততক্ষণ মূলত ওই ব্যক্তির জীবনপথেই ভ্রমণ করা হয়।

সীরাহ বলতে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ -এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জীবনীকেই বোঝানো হয়।

২. সীরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব

রাসূলে করীম সাঃ-এর জীবনী অধ্যয়ন করা কেবল শখ কিংবা আগ্রহের বিষয় নয়। বরং তা আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নির্দেশ।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
ط

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

[সূরা আল আহযাব ৩৩:২১]

ক. ইসলামের ইতিহাস জানা—

আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জীবনকে কেন্দ্র করেই ইসলামের ইতিহাস। সুতরাং তার জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আলী ইবনে আবি তালিবের নাতি আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব বলেছেন, ‘আমাদের যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই আল্লাহর রাসূল সাঃ - এর জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।’ অর্থাৎ সীরাহ তাদের কাছে এতটাই গুরুত্ব বহন করতো যে কুরআন অধ্যয়নের জন্য তাঁরা যেভাবে সময় দিতেন, সীরাহ অধ্যয়নের জন্যও তাঁরা একইভাবে সময় দিতেন।

খ. কুরআন বুঝতে সহায়ক—

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। সীরাহ অধ্যয়ন ছাড়া ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা সম্ভব না।

কুরআনের কিছু আয়াত নাযিল হওয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল না। যেমন— আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ পরিস্থিতি যা-ই থাকুক না কেনো এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার এমন কিছু আয়াতও রয়েছে যেগুলো আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। যেমন— সূরা আনফালের যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলো বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, সূরা দুহা নাযিল হয়েছিল রাসূল ﷺ এর নিকট সাময়িক ভাবে ওহী আসা বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে। সূরা আলে ইমরানের যুদ্ধ বিষয়ক আয়াতগুলোতে উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা সূরায় নেই। একমাত্র সীরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

গ. রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর প্রতি ভালোবাসা

দ্বীন ইসলামের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর প্রতি ভালোবাসা। রাসূল সাঃ বলেছেন, “তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার বাবা, তার সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৪)

নবী সাঃ -এর প্রতি ভালবাসা একটি মানদণ্ড, এই মানদণ্ডের দ্বারা নিজ নিজ ঈমান যাচাই করা যায়।

ঘ. মুসলিম উম্মাহের পুনর্জাগরণের মাধ্যম সীরাতে রাসূল সাঃ

সমগ্র মুসলিম জাতি এক উম্মাহ। এই উম্মাহের সোনালী অতীত সম্পর্কে মানুষ বেখবর। বর্তমানে উম্মাহের যে শোচনীয় অবস্থা তা দূরীকরণের মাধ্যম হচ্ছে সীরাতে অধ্যয়ন করা এবং নিজেদের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ করা।

বর্তমান সময়ে এই উম্মাহর অবস্থার উন্নয়ন হবে ঠিক সেই পন্থায় যে পন্থায় উত্তরণ হয়েছিল সাহাবীগণের ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের। আর সেই পন্থা জানা ও শেখার জন্য আমাদের ফিরে আসতে হবে সীরাতে রাসূল সাঃ -এর কাছে।

৩. নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

৩.১ প্রাক ইসলামী যুগে আরব সম্প্রদায়

জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ আরবের এবং আরব জাতির প্রথম আবাসস্থল— বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায় সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. আরবের বায়িদাহ : এরা হল ঐ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায় যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এদের খোঁজ খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

২. আরবে 'আরিবা : এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা ইয়াশজুব বিন ইয়া'রুব বিন ক্বাহত্বানের বংশোদ্ভূত। এদেরকে ক্বাহত্বানী আরব বলা হয়। তাদেরকে 'প্রকৃত আরব'ও বলা হয় কারণ তারাই প্রথম আরবীতে কথা শুরু করে।

৩. আরবে মুস্তারিবা : এরা হচ্ছেন ঐ আরব সম্প্রদায় যারা ইসমাইল আঃ -এর বংশধারা থেকে আগত। এদেরকে আদনানী আরব বলা হয়। আদনানীদের বংশধারা থেকেই রাসূল সাঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজক ছাড়া আরও কিছু ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব ছিল। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং সাবেয়ী (তারকাপূজারী) তাদের মধ্যে অন্যতম।

৩.২ প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের ধর্ম

তৎকালীন আরবরা দ্বীনে হানাফিয়াহ তথা ইবরাহীম আঃ এর ধর্মের অনুসারী ছিল ; সে সময় এটিই ছিল তাওহীদের ধর্ম। পরবর্তীকালে আমর বিন লুহাই নামক এক ব্যক্তি এই ধর্মে বিকৃতি সাধন করে। তারপর আরবরা দীর্ঘদিন মূর্তিপূজায় রত থাকে। রাসূল সাঃ -এর আগমণে এই দ্বীনে হানাফিয়াহ এর বিকৃতি দূর হয় এবং তাওহীদের ধর্ম ফিরে আসে।

ইসলামের পূর্বেও আরবরা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করতো না ; বরং তারা শিরক করলেও এই বিশ্বাস রাখতো যে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ আছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُقُولَنَّ اللَّهُ ُ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ!(সূরা লুকমান ৩১:২৫)

আরবদের গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক গোত্রের জন্য ছিল স্বতন্ত্র মূর্তি। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সাঃ কাবার অভ্যন্তরের সব মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেন।

৩.৩ যমযম কূপের উদ্ভব

মক্কা ও যমযম কূপের ইতিহাস জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ইবরাহীম (আঃ) এর সময়ে। ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন ইরাকের উর অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আঃ) এবং শিশু পুত্র ইসমাইল (আঃ) -কে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান, সেই জায়গাটি এখন মক্কা নামে পরিচিত। সেই সময় এ স্থানে না ছিল কোন জলাশয় বা পানির কোন উৎস, না ছিল কোন লোকালয় বা জনমানব বসতি। একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি ছোট মশকে কিছুটা পানি রেখে ইবরাহীম (আঃ) আবার পাড়ি জমালেন সেই ফিলিস্তিন ভূমে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল খেজুর, ফুরিয়ে গেল পানিও। কঠিন সংকটে নিপতিত হলেন হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাইল। কিন্তু এ ভয়াবহ সংকটেরও সমাধান হয়ে গেল আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে অলৌকিক পন্থায়।

একদিকে শিশু ইসমাইল (আঃ) ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অপরদিকে হাজেরা (আঃ) খাদ্যের সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ছোট্টাছুটি করছেন, এমন সময় আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায় শিশু ইসমাইল (আঃ) -এর পায়ের কাছে যমযম কূপের সূত্রপাত হয়। যমযম কূপের উপর পাখিদের ওড়াওড়ি দেখে জুরহুম নামক একটি যাযাবর গোত্র সেখানে আসে এবং হাজেরা (আঃ) -কে দেখে তাঁর কাছে সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি চায়। হাজেরা (আঃ) তাদের এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে যমযম কূপ তাঁর অধীনে থাকবে।

যদিও ইসমাইল (আঃ) জন্মগতভাবে ইরাকি ছিলেন, জুরহুম গোত্রের মাঝে বেড়ে ওঠায় তিনি আরবীতে কথা বলতে শুরু করেন এবং জুরহুম গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেন। সেখান থেকেই রাসূল সাঃ এর বংশধারা শুরু হয়। পরবর্তীতে ইবরাহিম (আঃ) মক্কায় এসে আল্লাহর নির্দেশে ইসমাইল (আঃ) কে সাথে নিয়ে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন।

৩.৪ যমযম কূপের পুনরুদ্ধার

ইসমাইল (আঃ) এর ইত্তিকালের পর মক্কায় জুরহুম গোত্রের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। তাদের শাসকগণ সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাদের নির্যাতন ও অপকর্মের মাত্রা বেড়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে মক্কার সব গোত্র একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করে এবং তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাবার সময় কাবা ঘরে সংরক্ষিত সব সম্পদ যমযম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে তার চিহ্ন মুছে দেয়।

জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে চলে যাওয়ার পর প্রায় ৩০০ বছর যমযম কূপ বিলুপ্ত অবস্থায় থাকে। অবশেষে আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে আবার আল্লাহ তা'আলা যমযম কূপ মানবজাতির সামনে নিয়ে আসেন।

আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নযোগে অবগত হন যে, তাঁকে যমযম কূপ খননের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং স্বপ্নযোগে তার স্থানও নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি তাঁর পুত্রকে নিয়ে খনন কাজ আরম্ভ করে দেন এবং যমযম কূপ পুনরুদ্ধার করেন।

৩.৫ আবরাহাৰ হস্তী বাহিনী

আবরাহা সাবাহ হাবশী যখন দেখলেন যে, আরববাসীরা কাবা গৃহে হজ্জ পালন করছেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছেন তখন সানআয় তিনি একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করলেন এবং আরববাসীদের সেখানে হজ্জ করার জন্য আহ্বান জানানেন। কিন্তু বনু কিনানাহ গোত্রের লোকজন সংবাদ জানার পর তাদের এক ব্যক্তি গোপনে গীর্জায় প্রবেশ করে মলত্যাগ করে নোংরা করে ফেললো। এ ঘটনায় আবরাহা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাবা গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ষাট হাজার অস্ত্র সজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি নিজে একটি শক্তিশালী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা তেরটি হস্তী ছিল।

আবরাহা যখন মুজদালেফা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়াদিয়ে মুহাস্সারে পৌঁছলেন তখন তার হাতি মাটিতে বসে পড়ল। কাবা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন ক্রমেই তাকে উঠানো সম্ভব হল না। অথচ উত্তর, দক্ষিণ কিংবা পূর্ব মুখে যাওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করলে তা তৎক্ষণাৎ উঠে দৌঁড়াতে শুরু করত। এমন সময়ে আল্লাহ তা'আলা এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী প্রেরণ করলেন। সেই পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আবরাহা ও তার বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন।

এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর জন্মের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে। হস্তী বাহিনীর এ ঘটনা ছিল আগামী দিনের নাবী সাঃ এবং কা'বা শরীফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা ফীল নাযিল করেন।

৪. রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আবির্ভাব

৪.১ জন্ম

রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কার প্রখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।

যখন রাসূল সাঃ এর মা আমিনা গর্ভবতী ছিলেন, তাঁর বাবা আবদুল্লাহ শামে সফররত অবস্থায় ছিলেন। মদিনার কাছাকাছি একটি স্থানে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। অর্থাৎ আবদুল্লাহ তাঁর পুত্রের জন্মের আগেই মারা যান।

ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর মা বলেছেন যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অটালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিল।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই আমিনা আবদুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শুনে তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে কা'বাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামন্ডিত এ শিশুর মুখমন্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এ নবজাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মাদ। আরববাসীদের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।

৪.২ দুধপান ও শৈশব

রাসূল সাঃ -এর মাতার পর সর্বপ্রথম তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। এরপর এই সৌভাগ্য অর্জন করেন বনু সা'দ গোত্রের হালিমাতুস সাদিয়া রা.।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে তৎকালীন নগরবাসী আরবগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথাটি ছিল শহর-নগরের জনাকীর্ণ পরিবেশে জনিত আধি-ব্যধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করার মাধ্যমে তারা যাতে বলিষ্ঠদেহ এবং মজবুত মাংসপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে সক্ষম হয় তদুদ্দেশ্যে দুগ্ধ পানের জন্য বেদুঈন পরিবারের ধাত্রীগণের হাতে শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রধানুযায়ী আবদুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ সাঃ -কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালিমা বিনতে আবু যুয়ায়বের নিকট তাকে সমর্পণ করেন। তার স্বামীর নাম ছিল হারিস বিন আব্দুল উযযা।

এ দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর দুগ্ধ সম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মান লাভ করে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ আব্দুল্লাহ, আনীসাহ, হুযাফা অথবা জুযামাহ।

হালিমার বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, হালিমা এবং তার স্বামী তাদের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ বনু সা'দ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। সেই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষজনিত দারুণ খাদ্য ও অর্থ সংকট বিরাজমান ছিল। তাদের দুর্বল গাধার কারণে তারা অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েন। তারা মক্কা পৌঁছে দেখেন, একজন ইয়াতিম শিশু ছাড়া অন্য সকল শিশু বাকি মহিলারা সংগ্রহ করে ফেলেছে। তাঁর স্বামী হারিসের সাথে পরামর্শ করে হালিমা ইয়াতিম শিশুটিকে নিয়ে তাঁর গোত্রে ফিরে আসেন। দুগ্ধপান কালে হালিমা

নাবী কারীম সাঃ -এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন এই শিশু সাধারণ কেউ না।

দুইবছর পর শিশু মুহাম্মাদ সাঃ-কে ফিরিয়ে দেয়ার সময় হলে হালিমা এবং তাঁর স্বামী মক্কায় গিয়ে আমিনার কাছে অনুনয়-বিনয় করে আরো কিছুদিন শিশু মুহাম্মাদ সাঃ -কে নিজেদের কাছে রাখার অনুমতি লাভ করেন।

৪.৩ বক্ষ বিদারণ

দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নাবী সাঃ বনু সা‘আদ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা‘আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস রাঃ হতে সহীহুল মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী সাঃ যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল আঃ সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, ‘এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।’ তারপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তন্তুরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা হালিমাকে বলল যে, মুহাম্মাদ সাঃ নিহত হয়েছেন। হালীমা এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাবী সাঃ -এর মুখমন্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবায়ত্নে লিপ্ত হলেন। আনাস রাঃ বলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি। এই ঘটনার পর ভীত হয়ে হালিমা মুহাম্মাদ সাঃ-কে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

পরবর্তীতে আরো ৩ বার তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয় বলে প্রসিদ্ধ মত আছে। ২য় বার বক্ষ বিদারণ হয় যখন তাঁর বয়স ১০ বছর। নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে ৩য় বারের মত তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়। মিরাজের রাত্রিতে বায়তুল্লাহ থেকে মাসজিদুল আকসায় গমনের পূর্বমূহর্তে ৪র্থ বারের মত তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়।

৪.৪ আমিনার মৃত্যু এবং দাদার কোলে শিশু মুহাম্মাদ সাঃ

কোলের শিশুকে ফেরত পেয়ে আমিনা ইয়াসরিব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তিনি শিশুপুত্র মুহাম্মাদ সাঃ এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উম্মু আয়মান শোকাহত মুহাম্মাদ সাঃ -কে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব পরম স্নেহে তাকে লালন পালন করতে থাকেন। মুহাম্মাদ সাঃ -এর ৮ বছর বয়সকালে আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ-এর চাচা আবু তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবু তালিবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।

৪.৫ স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে

চাচা আবু তালিবের সুরক্ষা ও যত্নের ছায়ায় বেড়ে ওঠেন রাসূল সাঃ। আবু তালিব তাঁকে যে আপন সন্তানাদির অন্যতম হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন তা-ই নয়, বরং নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা দিয়েই তাঁকে প্রতিপালন করতে থাকেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকেই একসময় তিনি ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তিনি তাঁকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দেন, সাহায্য করেন এবং তাঁকে তাঁর জীবনের পরবর্তী ৪০ বছর ধরে সহায়তা করে যান।

৪.৬ জাযিরার বাহিরে গমন

রাসূল সাঃ -এর বয়স যখন বার, সেই সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে তিনি শাম দেশে (সিরিয়া) গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বাহীরা বালক মুহাম্মাদ সাঃ -কে দেখেই বুঝতে পারেন, এই ছেলে একদিন আখেরী যামানার নবী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তিনি আবু তালিবকে এই সুসংবাদ দিলে আবু তালিব বাহীরার এরকম মনে হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। তখন বাহীরা আবু তালিবকে জানান, আসমানী কিতাবে বর্ণিত সব বৈশিষ্ট্যের সাথে এই বালকের গুণাবলীর স্পষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে। তিনি আবু তালিবকে আরো বলেন, মুহাম্মাদ সাঃ -কে তাঁর দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। নতুবা ইয়াহুদী এবং রুমীগণ তাঁর ক্ষতি করবে। এরপর আবু তালিব মুহাম্মাদ সাঃ -কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

৪.৭ হিলফুল ফুযূল

নবী মুহাম্মাদ সাঃ -এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান। এই যুদ্ধে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয় বলে এটি ‘ফিজার যুদ্ধ’ নামে খ্যাত। ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীদের দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। ভবিষ্যতে আরববাসীদের যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ’আনে তাঁর সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ থাকার কারণে আরববাসীর উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ

জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল ‘হিলফুল ফুযূল’ বা ‘হলফ-উল ফুযূল’।

পরবর্তীতে রাসূল সাঃ বলেন, “আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ানের গৃহে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, আমি এক পাল ভালো পশুর বিনিময়ে হলেও সেই চুক্তিতে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। আর যদি ইসলামের পরে এমন ঘটনা ঘটতো তখনও আমি বিষয়টিকে স্বাগত জানাতাম।”

৪.৮ খাদিজা রাঃ এর সঙ্গে বিবাহ

খাদিজা রাঃ ছিলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজা রাঃ -এর নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য লোক নিয়োগ করতেন, নিজে ঘরের বাহিরে বের হয়ে ব্যবসা করতেন না।

যখন খাদিজা রাঃ মুহাম্মাদ সাঃ -এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মাদ সাঃ -এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয় তাঁকে তার চাইতে অধিকমাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। মুহাম্মাদ সাঃ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।

সিরিয়া থেকে মুহাম্মাদ সাঃ -এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদিজা রাঃ -এর অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে ওঠে। অধিকন্তু, তাঁর দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মাদ সাঃ -এর মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি

বিষয় অবগত হওয়ার পর রাসূল সাঃ -এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তিনি নিজ অন্তরের ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নারীসা বিনতে মুনাবিবহ - এর নিকট ব্যক্ত করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ সাঃ -এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নারীসা খাদিজা রাঃ -এর প্রস্তাব সম্পর্কে নাবী কারীম সাঃ -কে জানালেন। নাবী কারীম সাঃ এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবু তালিব এ ব্যাপারে খাদিজা রাঃ -এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইটি প্রাণ বিশ্বমানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান।

নারী কারীম সাঃ এবং খাদিজা রাঃ -এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদিজাকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদিজা রাঃ -এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নাবী কারীম সাঃ -এর প্রথম সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদিজা রাঃ -এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'।

নারী কারীম সাঃ -এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাতিমা রাঃ ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। ফাতিমা রাঃ -এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম সাঃ -এর মৃত্যুর ছয় মাস পর।

৪.৯ কা'বা পুনর্নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন

রাসূল সাঃ এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কুরাইশগণ কা'বা পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, কা'বা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল (আঃ)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কা'বামুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় এর দেয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কা'বা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ কা'বা গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আব্বাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং অন্যেরা ভীত-সম্ভ্রান্ত চিণ্ডে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল।

প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে এজন্য কোন্ গোত্র কোন্ অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাঙ্কেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাকুম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। কিন্তু হাজারে আসওয়াদ সংস্থাপন নিয়ে গোত্রগুলোর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হয়। এই অবস্থায় মক্কার সর্বাধিক প্রবীণ পুরুষ আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা মাখযুমী সমাধান বাতলে দেন। তিনি বলেন, ‘আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সবার প্রথমে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন যে কোন গোত্র হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করবে।’

পরদিন সকালে দেখা গেলো, হযরত মুহাম্মাদ সাঃ সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হয়েছেন। সকলে তাঁকে দেখে আনন্দিত হলো এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলো। তিনি একটি চাদরে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদকে রেখে বিবদমান গোত্রপতিদের বললেন চাদরের প্রান্ত ধরার জন্য। তারা চাদরের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে পাথরসহ চাদর কা'বার সামনে নিয়ে এলেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ নিজ হাতে পাথর উত্তোলন করে জায়গামত স্থাপন করলেন। এভাবে বিবদমান গোত্রগুলো সকলেই হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করলো, বিষয়টিও সুন্দরভাবে মিটমাট হয়ে গেলো।

৪.১০ মেঘপালন— সকল নবীর পেশা

মুহাম্মাদ সাঃ বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকাবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে মাঠে গমন করতেন। মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরাতেন। তিনি বলেন— “আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি মেঘপালক ছিলেন না।” তাঁর সাথীরা জিজ্ঞেস করেন, “আর আপনি?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ, আমিও মাঠে ভেড়া চরাতাম আর মক্কার লোকদের থেকে এর কাজের জন্য বিনিময় নিতাম।”

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তা'আলা মেসপালনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মেসচালনা থেকে নবীগণ অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেগুলো হলো—

১. দায়িত্বশীলতা
২. ধৈর্য্য
৩. দূরদর্শিতা
৪. অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান
৫. অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে জীবনযাপন
৬. প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেয়া
৭. সৎপথে নিজের রুযি উপার্জন এবং শ্রমের মর্যাদা
৮. উম্মাহর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া
৯. আল্লাহর সৃষ্টির কাছাকাছি থাকা
১০. পেশা নির্বাচন

৫. রাসূল সাঃ এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে যে সকল সদগুণাবলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সবগুলোর চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনার যথার্থতা, পারদর্শিতা এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে প্রদান করা হয়েছিল সুষমামন্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা।

ক. বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুতীক্ষ্ণ বিচার বিবেচনাবোধ এবং নির্ভুল পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী। যার ফলে শত অন্যায়-অনাচার আর পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন পবিত্র।

খ. মুহাম্মাদ সাঃ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, সদালাপী, দয়ালু, দূরদর্শী, উন্নত ও আকর্ষণীয় আখলাকের অধিকারী।

গ. তিনি ছিলেন মানুষের দুঃখ দুর্দশার সাথী, আমানত রক্ষায় অগ্রগণ্য এবং ওয়াদা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর সত্যবাদিতা এবং আমানতদারিতার জন্য তিনি ‘আল-আমিন’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

ঘ. সেই সমাজে লাত-উযযার নামে শপথ করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু তিনি কখনোই এদের নামে শপথ করেননি। এমনকি লাত-উযযার নামে শপথ করার বিষয়টি তিনি সহ্যই করতে পারতেন না।

ঙ. মুহাম্মাদ সাঃ -কে আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল থেকে এমনভাবে হিফাজত করেছেন যে অজ্ঞতাবশত তিনি কখনোই কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হননি।

৬. নবুওয়াতপ্রাপ্তি

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পয়গম্বরী জীবনকালকে দুইটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যায়। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর এক অংশ থেকে ছিল ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। অংশ দুটি হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. মক্কায় অবস্থানকাল প্রায় তের বছর

২. মদীনায় অবস্থানকাল দশ বছর

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর মক্কাবস্থান কাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি আনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

১. সর্ব সাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (তিন বছর)।
২. মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছরের শেষ নাগাদ)।
৩. মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নুবুওয়াতী বর্ষের শেষ ভাগ হতে হিজরত পর্যন্ত)।

৬.১ হেরা গুহার অভ্যন্তরে

মুহাম্মাদ সাঃ যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। তাঁর এই নির্জনপ্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুকায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।

৬.২ ইকরা - পড়ো

রাসূল সাঃ হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। নিশ্চুপ, নিমগ্ন, নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। রাসূল সাঃ -এর যখন ৪০তম বছর পূর্ণ হল, তখন নবুওয়াতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাবুল আলামীন জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত নাযিল করে মুহাম্মাদ সাঃ -কে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হতে থাকলেন। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তণ না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুণরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

পূর্বের মতো খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তিনি হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরাগুহার নির্জনতায় অবস্থান করতে থাকেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়'। তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস

আমার নেই।’ তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘তুমি পড়’। তিনি আবারও বললেন, ‘আমার পড়ার অভ্যাস নেই’। তারপর তৃতীয় দফায় তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন ‘পড়-

(افْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ افْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) [العلق: 1: 3]

অর্থঃ “সেই প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিণ্ড থেকে। পড় সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।”

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নাবী কারীম সাঃ কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, ‘আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।’ খাদিজা রাঃ তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে খাদিজা রাঃ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ‘কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।’

এরপর খাদিজা রাঃ তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে ওয়ারাকা খ্রীস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁর কাছে বাইবেলের পান্ডুলিপি ছিল এবং তিনি সেগুলো থেকে পড়াশোনা করতেন। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাঃ যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হেরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহবল কণ্ঠে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, ‘ইনিই তো সেই বার্তাবাহক, যিনি মুসা আঃ -এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।’

তারপর বলতে থাকলেন, ‘হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।’

অরাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার ক্বওম আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?’

ওয়ারাকা বললেন, ‘হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।’ তিনি আরও বললেন ‘শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তা নিয়ে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।’ তিনি আরও বললেন, ‘মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।’ কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

৭. দাওয়াহ এবং প্রতিক্রিয়া

৭.১ প্রথম পর্যায় : গোপনে ইসলাম প্রচার

সূরাহ মুদ্দাসসিরের ১ম থেকে ৭ম আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাঃ পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-অর্চনা ব্যতীত কোন দ্বীন ছিল না। তাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত কোন সৎচরিত্র ছিল না। তাদের কোন সমস্যা তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না। তা সত্ত্বেও মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তুর্পণে ও সঙ্গোপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কাবাসীর সামনে আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায়।

৭.২ অগ্রগামী মুসলিমগণঃ

হযরত মুহাম্মাদ সাঃ দীর্ঘ ৩ বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যারা রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমন্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। এই সময়ে সংখ্যায় অল্প অথচ মানের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু মানুষ নাবী কারীম সাঃ -এর উপর ঈমান আনেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আবু বকর সিদ্দীক, আলি ইবনে আবি তালিব, য়ায়েদ বিন হারেসা, উসমান বিন আফফান, যুবায়ের বিন আওয়াম, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, আবদুর রহমান বিন আওফ, আরকাম বিন আবুল আরকাম প্রমুখ।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন— আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রুমী, 'আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ।

৭.৩ দারুল আরকামে জমায়েত

যখন মুসলিমদের একটি ছোট দল তৈরী হয়ে গেলো তখন রাসূল সাঃ সাহাবীদের নিয়ে সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত আরকাম রাঃ -এর গৃহে একত্রিত হতেন। সেখানে সালাত আদায় করতেন ও তাঁদেরকে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে শোনাতে। এই সময় সালাত ছাড়া অন্য কোনো ইবাদতের কথা জানা যায় না। এ সময় নাযিলকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ছিল— তাওহীদের বর্ণনা, নওমুসলিমদের উন্নত চরিত্র গঠন ও

আত্মশুদ্ধির পথে উদ্ধুদ্ধকরণ, জাহ্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এবং মুসলিমদের যুলুম ও নির্যাতনের মুখে সবার করার জন্য মানসিক শক্তির যোগান দেয়া।

এভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু ইসলামের দাওয়াত গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাসূল সাঃ -ও তা লোকসমাজে প্রকাশ করতেন না। তবে কুরাইশরা ইসলামের খবর জানতো। মক্কাতে ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকসমাজে এর মৃদু গুঞ্জন চলতে থাকে। শুরুর দিকে কুরাইশরা নবী মুহাম্মাদের আনীত নতুন ধর্মের খবর জানা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্ব দেয়নি ; কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করেনি দাওয়াতি কার্যক্রমে। কারণ তিনি তখনও পর্যন্ত তাদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূল সাঃ প্রকাশ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, তখন কুরাইশরা প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে।

৭.৪ দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আহ্বান

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো এবং ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দ্বীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়: “আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।” (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

প্রথম সম্মেলনঃ

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী কারীম সাঃ বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা ছিল পঁয়তালিশ

জন। সম্মেলনের শুরুতেই আবু লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, ‘দেখ এরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাক তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের আর অন্য কেউ তোমার চাইতে বড় সর্বনাশা হতে পারে।’ এই কথা পর নাবী কারীম সাঃ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় সম্মেলনঃ

এর কিছুদিন পর নাবী কারীম সাঃ স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

তারপর তিনি বলেনঃ “কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন, তোমরা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত

হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাসস্থল জন্মাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।”

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব তা জিজ্ঞেস করো না। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই।

আবু লাহাব বললেনঃ ‘আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমরাই ধরে নাও।’ আবু লাহাবেরাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবু তালিব বললেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

৭.৫ সাফা পর্বতের উপর

আবু তালিবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে একদিন রাসূল সাঃ পর্বতে আরোহণ করে ‘ইয়া সাবাহা!’ বলে জনসাধারণকে আহবান করলেন। ইয়া সাবাহা বলাটা সে যুগে ঘন্টা বা সাইরেন বাজানোর মত একটি বিষয় ছিল।

এ আহবান শ্রবণ করে সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকলকেই সেখানে উপস্থিত

হয়েছিলেন। আবু লাহাবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, স্থায়ী নবুওয়ত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহ্বান জানালেন।

নাবী কারীম সাঃ বললেন, “হে কুরাইশ বংশীয়গণ! তোমরা বল, আজ যদি আমি তোমাদের বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি?

সকলে সমস্বরে উত্তর করল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি।

তখন তিনি বলতে লাগলেন, “আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে।”

অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে সকলকে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে বললেন,

“হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সাঁপে দিয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জন করো।”

“হে বনু কা’ব বিন লুহাই, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না।”

“হে বনু কা’ব বিন মুররাহ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর।”

তিনি এভাবে প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ডেকে বললেন এবং সবশেষে নিজ কন্যা ফাতিমা কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

“হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে দোষখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুই মালিক নই। আমি তোমার জন্য

আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবো না। তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব। অর্থাৎ যথাযথভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখবো।”

যখন এ ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো সম্মেলন ভেঙ্গে গেল ও লোকজন যার যার মতো চলে গেল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু আবু লাহাব মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে নাবী সাঃ-এর নিকটে এসে বলে উঠলেন, ‘তোমার সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুমি এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে সূরা লাহাবের আয়াত নাযিল হলো।

এভাবে উচ্চকণ্ঠে আহবানের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের দাওয়াতের বাণী পৌঁছে দেয়া। এর প্রতিধ্বনি মক্কার অলি-গলিতে পৌঁছেই নি এমন সময় নাযিল হলো — “কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” (আল-হিজর : ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ মুশরিক সমাজে ও অলি-গলি ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনাতে থাকলেন, অন্যান্য রাসূলগণ যা দাওয়াত দিতেন তাই প্রচার করতে থাকলেন — “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।”

অতঃপর তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কুরাইশ নেতাদের সম্মুখে কাবাহ প্রাঙ্গণে সালাত আদায় করতেন। তাঁর দ্বীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং একের পর এক লোকজন শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি— উভয় দলের মধ্যে শত্রুতা-বিরোধিতা ক্রমে বেড়েই চললো এবং কুরাইশগণ সর্বদিক থেকে মুমিনদের ঘৃণা করতে থাকলো এবং তাদের সাধ্যমত ইসলামের সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো।

৭.৬ হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর প্রকাশ্য প্রচার অভিযানের কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দিলো। যেহেতু এ মৌসুমে আরব ভূমির দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হয়ে যাবে এবং মুহাম্মাদ সাঃ তাদের নিকটে প্রচারাভিযান শুরু করবেন সেহেতু তাঁর সম্পর্কে সমাগত সকলের নিকট এমন এক কথা বলার প্রয়োজন যার ফলে মুহাম্মাদ সাঃ -এর কথা তাদের উপর ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও শলাপরামর্শের জন্য তাঁরা ওয়ালীদ বিন মুগীরার গৃহে সমবেত হলো।

অন্যেরা রাসূল সাঃ -কে কবি, পাগল, কাহিন ইত্যাদি বলার প্রস্তাব করলে ওয়ালীদ বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, তাঁর কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর, তাঁর ভিত শিকড় বড়ই শক্ত এবং শাখা-প্রশাখা বড়ই মনোমুগ্ধকর। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যাই বল না কেন, যারা তাঁর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকবেন তাঁরা তোমাদের কথাবার্তাকে অবশ্যই মিথ্যা মনে করবেন।’ তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পুনরায় তিনি বললেন, ‘তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে খুব জোর যাদুকের বলতে পারো। তাঁর এটা কিছুটা উপযোগী বলে মনে হতে পারে। তিনি এমন সব কথা উত্থাপন করেছেন যা যাদু বলেই মনে হয়। তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে গোত্রে গোত্রে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’

শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে যাদুকের বলার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

তারা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলো। কিছু সংখ্যক কাফির মক্কায় আগমনকারী হজ্জযাত্রীগণের পথের পাশে কিংবা পথের মোড়ে মোড়ে জটলা করে নাবী কারীম সাঃ -এর প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলে হজ্জযাত্রীগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলো। এ সব ব্যাপারে আবু লাহাব অগ্রণী ভূমিকা

পালন করেছিল। হজ্জের মৌসুমে হজ্জ যাত্রীগণের শিবিরে এবং উকায, মাজিন্নাহ ও যুলমাজায বাজারে নাবী কারীম সাঃ যখন আল্লাহর একত্ব এবং দ্বীনের তাবলীগ করতেন তখন আবু লাহাব তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বলতো, ‘এর কথায় তোমরা কান দিয়ো না। সে মিথ্যুক এবং বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।’

এসব কথার ফলাফলে দেখা গেলো যে হজ্জযাত্রীরা আরো বেশী আগ্রহী হলেন। তাঁরা এ কথাও অবগত হয়ে গেলেন যে মুহাম্মাদ সাঃ নবুওয়াত দাবী করেছেন। এভাবে হজ্জ যাত্রীগণের মাধ্যমেই নাবী কারীম সাঃ -এর নবুওয়াত এবং ইসলামের প্রাথমিক কথাবার্তা সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করল।

৭.৭ প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার প্রতিক্রিয়া

রাসূল সাঃ -এর দাওয়াতের জবাবে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমাত্রিক। এক এক পর্যায়ে তারা এক এক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারেঃ

১. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
২. অপমান
৩. চরিত্রহননের চেষ্টা
৪. ইসলামের বার্তাকে বিকৃত করা ও কুৎসা রটানো
৫. রাসূল সাঃ -এর সাথে সমঝোতার চেষ্টা করা
৬. প্রলোভন
৭. চ্যালেঞ্জ
৮. চাপ প্রয়োগ
৯. হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা

১০. নির্যাতন-নিপীড়ন

১১. গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা

৭.৭.১ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

বিভিন্ন অবমাননাকর উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নাবী কারীম সাঃ -কে তাঁরা জর্জরিত এবং অতিষ্ঠ করে তুলতে চাইলেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে সন্দেহপরায়ণ, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের উদ্যম ও কাজের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে অশালীন অপবাদ এবং গালিগালাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তারা কখনো তাঁকে পাগল বলেও সম্বোধন করতেন। কখনো কখনো নাবী সাঃ -কে যাদুকর বলত এবং মিথ্যার অপবাদও দিত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছেঃ

“আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল- ‘এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক।’ (স্ব-দ ৩৮ : ৪)

অধিকন্তু, নাবী কারীম সাঃ যখন কোথাও গমন করতেন এবং তাঁর দুর্বল ও মজলুম সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেন তখন এদের লক্ষ্য করে মুশরিকগণ উপহাস করে বলতঃ

“এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন?” (আল-আন‘আম ৬ : ৫৩)

মুশরিকদের উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসাহাসি ও বিভিন্নভাবে আঘাতের মাত্রা এর বাড়িয়ে দিল যে তা নাবী সাঃ -কে মর্মান্বিত করে তুলল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

“আমি জানি, তারা যে সব কথা-বার্তা বলে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়।” (আল-হিজর ১৫ : ৯৭)

আল্লাহ তা’আলা আরো জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থার শীঘ্রই উন্নতি হবে এবং এ ঠাট্টা-বিত্রুপ তাদের ক্ষতির কারণ হবে।

“তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিত্রুপ করা হয়েছে, অতঃপর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিত্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।” (আল-আনআম ৬ : ১০)

৭.৭.২ সংশয় সন্দেহের উসকানি

নাবী সাঃ -এর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়াদির বিকৃত করে দেখানো, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা, নাবী সাঃ -এর শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা— এ সবগুলো অনবরত এত অধিক পরিমাণে করা যাতে জনসাধারণ তার দ্বীন প্রচারের দিকে ধীর স্থিরভাবে মনযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়। কখনো তারা বলত যে, কাহিনদের উপর যেমন জিন ও শয়তান নাযিল তেমনি তার উপরও একজন জিন ও শয়তান নাযিল হয়। একথার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন,

“তোমাদেরকে কি জানানো কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট”। (আশ্ শূআরা ২৬ : ২২১-২২২)

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আল্লাহ ভীতি, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য, আমানতদারীতা এবং তাঁর নবুওয়াত সত্য বলে জানা সত্ত্বেও কাফিরদের সন্দেহের কারণ এই যে, তারা বিশ্বাস করতো নবুওয়াত-রিসালত এমনই বড় ও মর্যাদাপূর্ণ পদ যে তা কোন মানুষের হাতে অর্পন করার মতো নয়। সুতরাং তাদের আকীদা-বিশ্বাস মতে যেমন কোন মানুষ রাসূল হতে পারেন না, তেমনি কোন রাসূল কক্ষনো মানুষ হতে পারেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (রঃ) যখন তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন আর মানুষদেরকে আহবান জানালেন সব

উপাস্যকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে তাদের বিবেক পেরেশান ও হতবাক হলো এবং তারা বলে উঠলো :

‘কেমন রসূল যে খাবার খায়, আবার হাট-বাজারে চলাফেরা করে ? তার কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?’ (আল-ফুরকান ২৫ : ৭)

তাদের এ দাবী খণ্ডন করে আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন,

“বল, তাহলে ঐ কিতাব কে অবতীর্ণ করেছিলেন যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা, যা ছিল মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও সঠিক পথের দিকদিশারী।” (আল-আন’আম ৬ : ৯১)

এভাবে একের পর এক তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে যা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারীদের তৃপ্তিদান করেছে। কিন্তু মুশরিকদের উদ্দেশ্য তো কেবল অহংকার-বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর জমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের মতামতকে বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দেয়া। ফলে তারা তাদের অবাধ্যতার উপরই অটল থাকলো।

৭.৭.৩ দাওয়াতে বাধা প্রদান

মুশরিকগণ মানুষদেরকে তাদের সাধ্যমত কুরআন ও ইসলামের দাওয়াতের কথা শ্রবণ করতে বাধা প্রদান করতো। তারা যখন দেখতে যে, নাবী সাঃ লোকেদের দ্বীনের পথে আহ্বান করছে বা সালাত আদায় করছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে তখন তারা মানুষদেরকে সেখান হতে তাড়িয়ে দিত, হৈচৈ-হৈ-হুল্লোড়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হটগোল পাকিয়ে দিত, গান গাইতো এবং নানা খেল-তামাশায় মেতে উঠত। অবস্থা এমন করে ফেলতো যে, নবী সাঃ সেখানে আর লোকেদের কুরআন তেলাওয়াত শোনাতে পারতেন না। এ অবস্থা পঞ্চম নবুওয়াতী বর্ষের শেষ অবধি চলে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে তাঁর তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে মুশরিকরা এরকম হটগোল বাধাত।

৭.৭.৪ অন্যায় অত্যাচার

তারা যখন এটা বুঝতে পারলও যে, তাদের এসব কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাঙিলাভের পথে তেমন কার্যকর হচ্ছে না, তখন তাঁরা সকলে পুনরায় এক আলোচনা চক্রে মিলিত হন এবং মুসলমানদের শাস্তি প্রদান ও তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রপতি তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি প্রদান করা শুরু করে দিল। অধিকন্তু ঈমান আনয়নকারী দাস-দাসীদের উপর তারা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিল।

আবু জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায়-অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি মুসলিম হতো তাহলে তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত এবং মারধোর করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করত।

◊ ‘উসমান বিন আফফানের চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নীচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত’

◊ মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর মা যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর পেল তখন সে তার খানা পানি (আহারাদি) বন্ধ করে দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম আয়েশ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে সপের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তার শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।

◊ বিলাল, উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তার গলায় দড়ি বেঁধে ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই দড়ি ধরে তাঁকে পথে প্রান্তরে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াত। এমনকি টানাটানির ফলে তার গলায় দড়ির দাগ বসে যেত। উমাইয়া স্বয়ং হাত পা বেঁধে তাকে প্রহার করত এবং

প্রথমে রোদে বসিয়ে রাখত। তাকে খানা পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এ সবেই চেয়েও অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর হতো তখন যখন দুপুর বেলা প্রথম রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং তাকে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হতো।

০ খাবার বিন আরাত খুয়া'আহ গোত্রের উম্মু আনমার সিবা' নামী এক মহিলার দাস ছিলেন। খাবার বিন আরাত ছিলেন কর্মকার। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু আনমার তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিত। উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তার পিঠ ও মাথায় সেক দিত যাতে মুহাম্মাদ সাঃ এর দীনকে অস্বীকার করে। কিন্তু এতে তার ঈমান ও ইসলামে টিকে থাকার সংকল্প আরো বৃদ্ধি পায়।

০ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবু বকর (রা.)-কেও শাস্তি পেতে হয়েছে। তাঁকে এবং তাঁর সাথে ত্বালহাহ বিন উবাইদুল্লাহকে সালাত থেকে বিরত রাখতে এবং দীন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নওফেল বিন খুওয়াইলিদ একই রশিতে শক্ত করে বেঁধে রাখতো।

প্রকৃত অবস্থা ছিল মুশরিকগণ যখন কারো মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তখন তাদের কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তারা বদ্ধ পরিকর হয়ে যেতেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দরিদ্র মুসলমানদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল তাদের নিকট একটি মামুলি ব্যাপার। বিশেষ করে দাস-দাসীদের শাস্তি দিতে কোন পরোয়াই করতো না। কেননা তাদের শাস্তি দেয়া কারণে কেউ ক্রুদ্ধও হতো না আর তাদের শাস্তি লাঘবের জন্য কেউ এগিয়েও আসতো না। তবে কোন বড় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শাস্তি দেয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে তারা যখন তাদের গোত্রের সম্মানীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হতেন। এসব সম্ভ্রান্ত লোকের উপর মুশরিকরা সামান্যই চড়াও হতো যদিও এদেরকেই তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে বেশি ভয় করতো।

৭.৮ রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান

তাদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে নিয়ে। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শত্রু-মিত্র পক্ষের কেউ তার নিকট আগমন করলে তাকে মান-মর্যাদা বা ইজ্জতের ভূষণে ভূষিত হয়েই সেখানে আগমন করতে হতো। নাবী কারীম সাঃ -এর উপর্যুক্ত গুণাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রসূত প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল চাচা আবু তালিবের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই আবু তালিব এত মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, তার কথা অমান্য করা কিংবা তার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার মতো দুঃসাহসিকতা কারোরই ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি, এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হল। সাত-পাঁচ এ জাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তিতর্কের পসরা নিয়ে তারা আবু তালিবের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

৭.৯ আবু তালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল

কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন, মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছেন। অতএব, হয় আপনি তাকে এ জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদের মতই তার বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তার ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হব।’

এর জবাবে আবু তালিব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে কথা-বার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। তারা ফিরে চলে গেলেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাঃ পূর্ণোদ্যমে তার

প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করতে থাকলেন এবং সেদিকে লোকেদেরকে আহ্বান জানাতে থাকলেন।

এদিকে কুরাইশগণও বেশি দেরি করলেন না যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ কাজ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত পূর্ণ মাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেনই, বরং তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় তারা পূর্বের চেয়ে আরো ক্রোধ ও গরম মেজাজ নিয়ে আবু তালিবের নিকট পুনরায় আগমন করলেন। কুরাইশ প্রধানগণ এবার কঠোরভাবে আবু তালিব সতর্ক করে দিলেন। এরপর আবু তালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সেই মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করতে না পেয়ে নাবী কারীম সাঃ -কে ডেকে পাঠালেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে আবু তালিব তাঁর নিকট কুরাইশ প্রধানগণের আলোচনা এবং আচরণ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।’

রাসূলুল্লাহ সাঃ ধারণা করলেন, মানবকুলের মধ্যে তার একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সহায় চাচাও বোধ হয় আজ থেকে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন এবং তাকে সাহায্য দানের ব্যাপারে তিনিও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। তবু তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বললেন, ‘চাচাজান, আল্লাহর শপথ। যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও শাস্ত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু চাচাজান! আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।’

আবু তালিব তাঁর অদম্য সাহস দেখে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি কখনোই রাসূল সাঃ -কে পরিত্যাগ করবেন না।

চড়া কড়া কথা বার্তা এবং যুদ্ধের হুমকি দিয়েও যখন তেমন কিছুই হল না তখন একদিন আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে কুরাইশরা প্রস্তাব দিলো অলীদ বিন

মুগীরাহর সন্তান ওমরাহকে গ্রহণ করে মুহাম্মাদ সাঃ -কে কুরাইশদের হাতে সমর্পণ করতে। আবু তালিব রেগে গেলেন এবং তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সাথে সরাসরি শত্রুতা পোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

৮. আবিসিনিয়ার পথে

৮.১ প্রথম হিজরত

নবুওয়াতের ৪র্থ বর্ষের মধ্যভাগ কিংবা শেষভাগ থেকেই কাফিরদের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। ৫ম বর্ষে গিয়ে তা একেবারে চরম আকার ধারণ করে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরাহ যুমার।

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় ‘ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।” (আয-যুমার ৩৯ : ১০)

এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের নিরাপদ ভূমিতে পাড়ি জমানোর অনুমতি দিলেন।

রাসূল সাঃ বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু, সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবীগণ রাঃ -কে নির্দেশ প্রদান করেন।

অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবীর একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমালেন। এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী। এদের মধ্যে রাসূল সাঃ এর কন্যা রুকাইয়া রাঃ এবং তাঁর স্বামী উসমান বিন আফফান রাঃ ছিলেন। ১৬ জনের এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে রওনা হয়ে জেদ্দার সমুদ্রবন্দরে পৌঁছালেন। সেখানে তাঁরা আবিসিনিয়ার দুটি জাহাজ দেখতে পেলেন। কুরাইশরা খবর পেয়ে এই দলটিকে ধরার জন্য রওনা দিলো। কিন্তু তারা বন্দরে যাওয়ার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দিল এবং সাহাবীগণ নিরাপদে আবিসিনিয়া পৌঁছালেন। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

৮.২ কাফিরদের সিজদাহ

একই বছর রমযান মাসে কুরাইশদের এক বিরাট জনতা হারাম শরীফে অবস্থান করছিলো। নাবী কারীম সাঃ সেখানে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে সূরা ‘নাজম’ পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ইতোপূর্বে কুরআন পাঠের সময় তারা যেভাবে গন্ডগোল করত সে রকম গন্ডগোল করা তো দূরের কথা বরং আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে তারা তা শুনতে থাকল। তারপর নাবী কারীম সাঃ যখন এ সূরাহর শেষের আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকলেন তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে থাকল। যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ-সম্বলিত শেষের আয়াতটি পাঠ করলেন :

(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا)

“তাই, আল্লাহর উদ্দেশে সিজদাহ_য় পতিত হও আর তাঁর বন্দেগী কর।” [সাজদাহ]

(আন-নাজম ৫৩ : ৬২)

অতঃপর রাসূল সাঃ সিজদা করলেন এবং সাথে উপস্থিত মুশরিকরাও সকলে সিজদা করল। কুরাইশ মুশরিকদের সিজদাহ করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমগণের নিকটও গিয়ে পৌঁছল। মক্কার কুরাইশগণ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন, এ খবর শুনে পরবর্তী শাওয়াল মাসেই তাঁদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কার নিকটে তাঁরা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানার পর দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়া অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে কিংবা কুরাইশগণের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। এর পর মক্কা প্রত্যগত মুহাজিরগণের উপর বিশেষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণের উপর সাধারণভাবে কুরাইশগণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজিরগণই নন, এমন কি তাঁদের পরিবার পরিজনও এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেল না। কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ সাঃ পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে।

৮.৩ দ্বিতীয় হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় হিজরত ছিল খুবই কঠিন। কেননা প্রথম হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন।

৮.৪ মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

কুরাইশদের পক্ষ হতে আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ প্রেরণ করা হয়। তারা সেখানে গিয়ে নাজ্জাশীর কাছে মুহাজিরদের

নামে অভিযোগ দায়ের করে তাঁদের মক্কা ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানায়। কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য মুসলিমদের আহ্বান জানানেন।

মুসলিমদের পক্ষ হতে হযরত জাফর বিন আবু তালিব অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। অতঃপর জাফর রাঃ সুরা মারইয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। নাজ্জাশী মুগ্ধ হলেন এবং কুরাইশ দূতগণের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তারা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলো এবং পরদিন আবার নাজ্জাশীর কাছে অভিযোগ জানালো যে, মুসলিমরা ঈসা বিন মারইয়াম সম্পর্কে এমন কথা বলে যা এর আগে কেউ কোনোদিন বলেনি। একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা আঃ সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। কারণ ঈসা আঃ সম্পর্কে খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে তত্ত্বগত মত পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন মসীহ আল্লাহর পুত্র। কিন্তু মুসলিমগণ বলেন ঈসা আঃ হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মুসলিমদের সংশয় এ কারণে যে, এ কথা বললে সম্রাট নাজ্জাশী যদি বিরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জাফর বললেন, ‘আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা আঃ হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মারইয়াম ছিলেন সতী-সাদ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাদীনে কুমারী মারইয়ামের গর্ভে ঈসা আঃ -এর জন্ম হয়।’

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, ‘আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা আঃ -এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।’

এরপর তিনি মুসলিমদের সেখানে নিরাপদে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং কুরাইশদের উপটৌকন ফিরিয়ে দিলেন।

৮.৫ হত্যার ষড়যন্ত্র

এতকিছুর পরেও যখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারলো না তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

৯. বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের দাওয়াতি পরিক্রমা রুখতে কুরাইশদের তৎপরতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিলো। অপরদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো মুসলমানদের সংখ্যাও। দুইজন বিশেষ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ দ্বারা ইসলামের শক্তি আরো সুদৃঢ় হয়। তাঁদের একজন হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব রাঃ এবং অপরজন উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ।

০ একদিন শিকার থেকে ফিরে হামযাহ রাঃ খবর পেলেন আবু জাহেল হযরত মুহাম্মাদ সাঃ -কে অপমানিত করেছে। ভাতিজার উপর আক্রমণকে তিনি নিজের অপমান হিসেবে নিলেন এবং আবু জাহেলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে আঘাত করে বললেন তিনি নিজেও মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসারী। হামযাহ রাঃ শুধুমাত্র জেদ করে কথাটা বলেছিলেন। বাড়ি ফেরার পর তিনি বুঝতে পারলেন ঝোঁকের বশে কি ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন তাঁকে সত্য পথ দেখানোর জন্য। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি অনুভব করলেন তাঁর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গিয়েছে এবং তিনি রাসূল সাঃ -এর নিকটে গিয়ে মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

০ উমার রাঃ -এর ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল সাঃ -এর দু'আর ফসল। তিনি ইসলাম গ্রহণের মাত্র একদিন আগে রাসূল সাঃ দু'আ করেছিলেন,

“হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।”

আল্লাহ তা'আলা এ দু'আ কবুল করলেন এবং উমার রাঃ মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ পুরো মুসলিম সমাজের পরিস্থিতি বদলে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, ‘উমার মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতাম। তিনি মুসলিম হওয়ার পর আমরা গর্বের সাথে আমাদের ইসলামের কথা বলে বেড়াতাম।’

উমার বিন খাত্তাব রাঃ ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্চিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল।

“উমরের মুসলিম হওয়া ছিল বিজয়, তাঁর মদিনায় হিজরত ছিল ইসলামের সহায় আর তাঁর শাসন ছিল রাহমাহ।” — আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ এর এই একটি কথায় বোঝা যায় উমর রাঃ ইসলামের ইতিহাসে কত উঁচু স্থান দখল করে রেখেছেন।

১০. বয়কট

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করলো ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছেন আর মক্কায় উমার রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত

নিল যে, নবী সাঃ -কে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। মরিয়্যা হয়ে রাসূলুল্লাহর ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিমকে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব-এ দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয় নি, কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মুশরিকগণ ‘মুহাসসাব’ নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানার ভিতরে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো যে, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন, মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা জারী থাকবে। মাক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররাম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। লিখিত চুক্তিপত্রটি কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

১০.১ শি'আবে আবু তালিবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা

বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা,

চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। পরিস্থিতি বেশ খারাপ আকার ধারণ করে। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে। সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন, 'আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো।' বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

১০.২ বয়কটের অবসান

এরূপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হলো। বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি প্রথম উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। চুক্তি বাতিল করার পেছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি আরো চারজনকে খুঁজে বের করলেন যারা এই চুক্তির বিপক্ষে। পরদিন তাঁরা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে বয়কটের বিরোধিতা করেন।

ঐ সময় আবু তালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর পক্ষ থেকে তাদের জানাতে এসেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। দুই বা তিন বছর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার পর এভাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। শি'আবে আবু তালিব থেকে মুক্তির পর আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা কাবা ঘরের সামনে এলেন এবং কাবা ঘরের পর্দা জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দুয়া করলেন- 'হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে যুলুম করেছে, আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক কর্তন করেছে এবং আমাদের বেইজ্জতি করেছে তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নাও।'।

১০.৩ আবু তালিবের নিকট শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল

গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর পূর্বের মতো আবারও রাসূলুল্লাহ সাঃ দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অপরপক্ষে মুশরিকগণ যদিও বয়কট পরিহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তবুও পূর্বের মতই মুসলিমদের উপর চাপসৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকল। আবু তালিবও পূর্বের মতই ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করতে থাকলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে থাকলেন। কিন্তু শি'আবে আবু তালিব থেকে বের হওয়ার পর তিনি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন মুশরিকগণ চিন্তা-ভাবনা করল যদি আবু তালিবের মৃত্যু হয় এবং তারা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করে তবে এতে তাদের খুব বড় রকমের বদনাম হয়ে যাবে। এ কারণে আবু তালিবের সামনেই মুহাম্মাদ সাঃ সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এসব ভেবে তাদের এক প্রতিনিধি দল পুনরায় আবু তালিবের নিকট আগমণ করলো। তারা আবু তালিবকে তাঁর ভাতিজার থেকে অঙ্গীকার নিতে বললো যাতে তাদের ধর্মমতের উপর মুহাম্মাদ সাঃ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে এবং তারাও মুহাম্মাদ সাঃ -এর ধর্মমতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু এবারেও তাদের প্রস্তাব বৃথা গেলো।

১১. শোকের বছর

মাক্কী জীবনের দশম বছরকে বলা হয় আমুল হযন বা দুঃখের বছর। বার্ষিক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবু তালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে রাসূল সাঃ তাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন একবার অন্তত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাটি পাঠ করেন। কিন্তু অপর পাশে থেকে আবু জাহেল তার পূর্বপুরুষদের দ্বীনের কথা বলে বাধা প্রদান করতে থাকলো। শেষমেশ ওই অবস্থায় আবু তালিবের মৃত্যু হয়।

এর কিছুদিন পর রমযান মাসের ১০ তারিখে রাসূল সাঃ -এর সহধর্মিণী খাদিজা রাঃ ইন্তিকাল করেন। এই বছরটি ছিল আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর বছর, কারণ এ সময়ে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় দুইজন মানুষকে হারিয়েছেন। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে এসেছেন, সুখে-দুঃখে, বিপদে আপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাকে সমর্থন দিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নাবী সাঃ -এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিণীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে।

১১.১ সাওদা রাঃ -কে বিবাহ

নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাঃ সাওদা বিনতে যাম'আহ রাঃ -কে বিবাহ করেন। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিম ছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদা তাঁর সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হলে ইদত পালন শেষে নাবী কারীম সাঃ তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়।

১২. তায়েফের ঘটনাবলী

আবু তালিবের মৃত্যুর ফলে রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর নিরাপত্তার ঢালটি হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় মুশরিকদের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী সাঃ ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা নানামুখী নির্যাতন শুরু করলো। প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে মুশরিকদের নির্যাতন ; পর্বতসম ধৈর্যের অধিকারী হয়েও নাবী সাঃ -এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে

কিছুটা আশায় বুক বেঁধে তিনি যায়েদ বিন হারিসা রাঃ -কে নিয়ে তায়েফের পথে অগ্রসর হন। যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। সেখানে গমন করে সাক্ষীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বললো, ‘সে কাবার পর্দা ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন।’ দ্বিতীয়জন বললো, ‘নাবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি?’ তৃতীয়জন বললো, ‘তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নাবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।’ তাঁদের এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুব্ধ হলেন এবং সেখান থেকে যাবার সময় শুধু বললেন, ‘তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখ।’

রাসূলুল্লাহ সাঃ তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা রাসূল সাঃ -এর দাওয়াত কবুল করলো না বরং খারাপ আচরণ করলো আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর সাথে। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত, অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য উশ্ণুখল শিশু কিশোর ও যুবকদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দু’পাশ ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল।

তায়ফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ বিন হারিসা তাঁকে রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ পথ চলতে থাকেন এবং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায়

একটি আঙুল বাগানে আশ্রয় নেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নাবী কারীম সাঃ আল্লাহ তা‘আলার দরবারে হাত তুলে দু‘আ করলেন। তাঁর এ দু‘আ ‘দুর্বলদের দু‘আ’ নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দু‘আর এক একটি কথা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু‘আ করলেন,

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়তা আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু, তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই। তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার হাতে ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।”

দূর থেকে রাসূল সাঃ -এর অবস্থা দেখে বাগানের মালিকদ্বয় তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হলো এবং তাদের ক্রীতদাসকে রাসূল সাঃ -এর নিকট কিছু আঙুর দিয়ে পাঠালো। রাসূল সাঃ আঙুর খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বললেন, এটা শুনে ক্রীতদাস অবাক হয়ে গেলো। কিছু কথোপকথনের পর ক্রীতদাস নাবী কারীম সাঃ -এর সত্যতা অনুভব করলো এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।

কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ বাগান থেকে বের হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তিনি যখন ‘কারনে মানাযেল’ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল আঃ সেখানে পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাদের সাথে

নিয়ে আগমন করেন। আল্লাহর तरফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নাবী সাঃ যদি ইচ্ছা করেন তা হলে তারা দু'পাহাড়কে একত্রিত করে দূরাচার মক্কাবাসীকে পিষে মারবেন। নাবী কারীম সাঃ বললেন, “না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাবে না।”

আসমান থেকে সাহায্য পেয়ে রাসূলুল্লাহর মন শান্ত হলো। আবার তিনি চলতে শুরু করলেন, থামলেন ওয়াদীয়া নাখলায়। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, সে এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু জ্বীন, তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে এসে কুরআনের আরও কিছু আয়াত শিখে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়।

১৩. ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

রাসূল সাঃ তায়েফ থেকে ফিরে এসে মুতগ্গিম বিন আদীর আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। রাসূল সাঃ এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন তখন চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু রাসূল সাঃ তাদের এই জুলুম-নির্যাতনের কারণে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করেননি। সীমাহীন বিপদগ্রস্ত আর নির্যাতনের শিকার হয়েও বেড়েই চলছিলো তার দাওয়াতি কাজের গতি। তিনি এমন একটি ঘাঁটি বা কেন্দ্রীয় ভূমির অভাব অনুভব করছিলেন যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আগত বিভিন্ন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করা শুরু করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাঁকে আশ্রয় ও সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। কিন্তু সবাই তাঁকে ফিরিয়ে দিলো।

মক্কাবাসী মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং লোকজনকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতার যে দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিল

তা এড়িয়ে চলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর কর্ম কৌশল পরিবর্তন করে নিলেন। মুশরিকরা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য তিনি রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন। এ পদ্ধতির অনুসরণকালে একরাতে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সাথে ইয়াসরিবের খায়রাজ গোত্রের ছয় জন যুবকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাঁদের সম্মুখে ইসলামের হাকীকত বর্ণনা করার পর কুরআন মাজীদ থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর তাঁরা যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সেই সঙ্গে ইসলামের সংবাদ ও পয়গাম সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যার ফলে সেখানে ঘরে ঘরে রাসূল সাঃ -এর দাওয়াত প্রসার লাভ করল।

১৪. আয়িশাহ রাঃ -এর সাথে বিবাহ

একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাঃ ‘আয়িশাহ রাঃ -এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে মনোনীত নয় বছর বয়সে উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশাহ রাঃ স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।

১৫. ইসরা ও মিরাজ

ইসরা অর্থ ‘রাত্রিকালীন ভ্রমণ’। রাসূল সাঃ আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল আঃ -এর সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ‘ইসরা’।

মিরাজ অর্থ ‘উপরে আরোহনের মাধ্যম বা সিড়ি’। আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাঃ -কে ভূমি থেকে আসমানে আরোহন করিয়ে প্রথম আসমান থেকে শুরু করে সপ্ত আসমান ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। একে মিরাজ বলা হয়।

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল আঃ মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নাবীগণ আঃ -এর জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম আসমানের দরজা খোলা হল সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম আঃ -এর রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জিবরাঈল আঃ এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, ‘ইনি হচ্ছেন আপনার আদি পিতা আদম আঃ। একে সালাম করুন।’ এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। আদম আঃ তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মাসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম আঃ -এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁদের শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ ও উম্মে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ আঃ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস আঃ -কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান আঃ -কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাসূলে কারীম সাঃ -কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুসা বিন ইমরান আঃ -এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মুসা আঃ সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আঃ -এর সঙ্গে, রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্ভ্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। চলার শেষ পর্যায়ে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ 'সর্বশেষ প্রান্তের কূলগাছ'। এটি এমন এক স্থান যে এর নীচ থেকে কোনো বস্তু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়। তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরাঈল আঃ -কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেলেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ এসময় রাসূলকে তিনটি বিষয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন-

* পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

* সুরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু এবং

* রাসূলের উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে না আল্লাহ তার কবির গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ কবির গুনাহগার জাহান্নামী হবে তবে কাফির-মুশরিকদের মত চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং কবীর গুনাহের অনেকেই নবীদের

সুপারিশে, কেউ আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের সুপারিশে কেউবা নিছক আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্ষমা লাভ করবে।

এ সময় পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল ‘আপনাকে ফিতরাতে (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে। তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। তিনি জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখমন্ডলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন। তিনি ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎকারী, সুদখোর, ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, ‘যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ সকালবেলা স্বগোষ্ঠীয় লোকজনের নিকট আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। এর ফলে নির্দিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণ ও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমন কি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না।

পক্ষান্তরে আবু বকর রাঃ এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে তাঁকে ‘সিদ্দীক’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তঃকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

১৬. ইসলামের দূর্গঃ আল আনসার

১৬.১ আকাবার প্রথম বাইয়াত

একাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ‘আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব।’ এর ফল হল যে, পরবর্তী বছর যখন হজ্জের মৌসুম এল তখন পূর্বের পাঁচজন সহ মোট বারোজন লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। তারা ইয়াসরিবের আউস ও খায়রাজ গোত্রের ছিলেন। তারা মিনার ‘আক্কাবাহর নিকটে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাদানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ থেকে বাইআত গ্রহণ করে। এই বাইআত মিনার অভ্যন্তরে আকাবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

১৬.২ মুসআব বিন উমাইরের প্রতিনিধিত্ব

৬২১ সালে ইয়াসরিব থেকে আগত দলটি রাসূলের হাতে বাইআত গ্রহণের পরে রাসূল সাঃ এই নওমুসলিম দলকে ইসলামি বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব বিন উমাইর রাঃ -কে প্রতিনিধি বানিয়ে মুসলিমদের একটি দল তাদের সাথে প্রেরণ করেন। মুসআব ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য সাহাবী। তিনি আবিসিনিয়ায় প্রথম মুহাজিরদের একজন। পরবর্তী সময়ে বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। মুসআব বিন উমাইয়ের রাঃ ইয়াসরিবে গিয়ে আস’আদ বিন যুবারাহ রাঃ -এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াসরিববাসীদের নিকট প্রবল উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রচারণার

কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর উত্তম প্রচার কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ‘মুকরিউন’ উপাধিতে ভূষিত হন। কেবলমাত্র বনি উমাইয়া বিন যায়দ, খাতমা ও ওয়ায়েলের বাড়ি ব্যতীত আনসারদের এমন কোন বাড়ি ছিল না যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম হন নি। পরবর্তী হজ্জ মৌসুম পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ নবুওয়াত বর্ষের হজ্জ মৌসুম আগমনের পূর্বেই মুসয়াব বিন উমায়ের রাঃ তাঁর সাফল্যের সংবাদ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর দরবারে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে ইয়াসরিবের গোত্রগুলোর অবস্থা, তাদের রণকৌশল ও প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতার উৎকর্ষতা সম্পর্কে অবগত করেন।

১৬.৩ আকাবার দ্বিতীয় বাইআত

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিবের সত্তর জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে জামরাই ‘আকাবার নিকটস্থ সুড়ঙ্গে একত্রিত হলেন। নাবী সাঃ যখন মদীনায় হিজরত করবেন, তখন তাঁকে নিরাপত্তা এবং হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা নবীজির কাছে বাইআত গ্রহণ করেন। এই বাইআতকে ৬২২ সালে ঘটিত আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

ইমাম আহমাদ জাবির রাঃ হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেছেন, ‘আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাঃ! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?’

তিনি বললেন, ‘তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।
২. অভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।
৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।’

বাইআতের শর্ত বা দফাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিক গুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্তর বলে উঠলেন, ‘আস’আদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না।’ উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আস’আদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। আবু উমামা আস’আদ বিন যুরারাহ সর্ব প্রথম মানুষ যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। এরপর সাধারণ অঙ্গীকার অনুষ্ঠিত হয়। জাবির রাঃ -এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা একে একে দাঁড়ালাম আর নাবী কারীম সাঃ আমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।

অঙ্গীকার পর্ব সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ সাঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে থেকে বারোজন নেতা নির্বাচন করলেন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীকারের ধারাসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে জিম্মাদারী ও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যখন এ সকল নেতার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল তখন নাবী কারীম সাঃ তাঁদের নিকট থেকে পুনরায় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

আকাবার প্রথম বাইয়াত থেকে দ্বিতীয় বাইয়াতের পার্থক্য হলো— প্রথম বাইয়াতে শুধুমাত্র শিরক ও কতিপয় কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বাইয়াতে এগুলোর সাথে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছিল— আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি।

১৭. ইয়াসরিব হলো মদীনা

মদীনার পূর্বনাম ছিল ইয়াসরিব। রাসূল সাঃ এই নাম পরিবর্তন করতে চাইলেন। ইয়াসরিবের ইতিহাস ছিল শত্রুতা আর যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর, তাই রাসূলুল্লাহ সাঃ একে একটি নতুন পরিচয়ে পরিচিত করতে চাইলেন। ফলে এর নতুন নাম হলো ‘মদীনা’। মদীনাতুর রাসূলুল্লাহ সাঃ বা রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর শহর।

১৭.১ হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী

হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ সুবিধা ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এবং ধন দৌলত ও সহায় সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। মুশরিকবেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে। জানা ছিল না আগামীতে কোন্ ধরনের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে। মুসলিমগণ এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করল।

১. সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামাহ রাঃ। ইবনে ইসহাকের মতে তিনি ‘আক্কাবাহর বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুরপক্ষ তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিতে দিলো না। এতে আবু সালামাহ রাঃ -এর আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর সন্তানকে রেখে দিলেন তাদের কাছে। এ কারণে আবু সালামাহকে একাকী মদীনা গমন করতে হয়। এরপর থেকে উম্মু সালামাহ রাঃ -এর

অবস্থা এমনটি হল যে, প্রত্যহ সকালে তিনি আবতাহ (যেখানে এ ঘটনা ঘটেছিল) আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কোন এক আত্মীয় গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিবার তাঁকে অনুমতি দিল। তখন তিনি সন্তানটিকে তার দাদার বাড়ী হতে ফেরত নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। এ সফর হলো দীর্ঘ পাঁচশত কিলোমিটারের। আর তাঁকে পথ চলতে হবে দুর্গম পাহাড় ও ভয়ংকর সব উপত্যকা হয়ে অথচ সাথে কোনো সঙ্গী-সাথী নেই। সন্তান সহ যখন তিনি তানঈম গিয়ে পৌঁছিলেন তখন উসমান বিন আবু ত্বালহার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অবস্থা অবগত হয়ে সহযাত্রীরূপে মদীনা পৌঁছানোর জন্য নিয়ে গেলেন। যখন জনবসতি দৃষ্টি গোচর হল তখন তিনি বললেন, ‘এ গ্রামে তোমার স্বামী আছেন, এ গ্রামে চলে যাও। আল্লাহ বরকতময়, বরকত দিন’। এরপর তিনি মক্কার অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

২. সুহাইব (রাঃ) যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ বলল, ‘তুমি যখন আমাদের নিকট এসেছিলে তখন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক ছিলে। কিন্তু এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন সম্পদ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এখন তুমি চাচ্ছ যে, তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! এ কিছুতেই হতে পারে না।’

সুহাইব রাঃ তখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর মহব্বতে তাঁর সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন আবেগে আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘সুহাইব লাভবান হয়েছেন, সুহাইব লাভবান হয়েছেন।’

৩. উমার রাঃ কুরাইশদের বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না। সবাই মদীনায় হিজরত করেছিলেন গোপনে। আর উমার রাঃ রীতিমত ঢাক ঢোল পিটিয়ে হিজরত করেন। তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে কুরাইশদের সামনে ধীরে সুস্থে ৭ বার

কা'বাঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর মাক্কাতে গিয়ে আন্তে ধীরে সালাত আদায় করে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কুরাইশরা বসা ছিল, তাদের সামনে ধীরেসুস্থে সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। তারপর মাক্কাতে গিয়ে আন্তে ধীরে সালাত আদায় করলেন। তারপর জনসমাগমের দিকে গেলেন, এক এক করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'তোদের মুখে চুনকালি পড়ুক! আল্লাহ তোদের ওই নাক ধূলোয় গড়াগড়ি খাওয়াবেন। কে আছে বাপের ব্যাটা, বুকের পাটা থাকলে আয়! যদি স্ত্রীর বিধবা হওয়ার ভয় না করিস, সন্তানের এতিম হওয়ার ভয় না করিস, নিজের মাকে সন্তানহারা বানাতে ভয় না পাস, তাহলে এই পাহাড়ে আয়! আমার সাথে লড়ে দেখা!'

কেউ তাঁর সাথে লড়ার সাহস দেখালো না। বরং তিনি দলবল নিয়ে হিজরত করতে রওনা হলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, 'আমি, আইয়্যাশ ইবন আবু রাবিআ এবং হিশাম ইবন আস –আমরা পরিকল্পনা করলাম একসাথে মদীনায় হিজরত করবো। আমরা সারিফের উপর মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করলাম। আমরা ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ভোরে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সে আটকা পড়েছে, সুতরাং বাকিরা তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে মদীনায় যাত্রা শুরু করে দিবে।'

সারিফ মক্কার বাইরে একটি জায়গা, উমার ও আইয়্যাশ ভোরে সেখানে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু হিশাম ইবন আসকে দেখা গেল না। তাই উমার আর আইয়্যাশ দুজন মিলেই যাত্রা শুরু করে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও সাহাবীদের হিজরতের ধারা অব্যাহত থাকল যার ফলে 'আক্কাবাহর বড় অঙ্গীকারের পর মাত্র দু'মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ সাঃ, আবু বকর ও আলী রাঃ ব্যতীত কোন মুসলমান মক্কাতে অবশিষ্ট ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নির্দেশে তাঁরা দু'জন মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। অবশ্য আরও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন।

মুশরিকগণ বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ নিজ মাল-সামানা গোছগাছ করে রেখে যাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে আল্লাহ তা‘আলার আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। আবু বকর রাঃ -এর প্রবাসের সামগ্রী বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

১৮. নতুন ভূমির সন্ধানে : হিজরত

১৮.১ দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের অধিবেশন

মুশরিকরা যখন দেখলো মুসলিমরা একে একে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় জমা হচ্ছে তারা অস্থির হয়ে গেল। মুসলিমদের মদীনায় হিজরতের ফলাফল কী হতে পারে তা তাদের অজানা ছিল না। তারা টের পেয়েছিল আওস এবং খায়রাজ গোত্র রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মদীনায় মুসলিমদের ঘাঁটি গড়ার অর্থ হলো, তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া, কেননা কুরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সে পথেই কুরাইশদের কাফেলা চলাচলা করতো আর মদীনা থেকে সে পথ খুব দূরে নয়। কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, মদীনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে। অত্যাচার-নির্যাতন, প্রলোভন, সমঝোতা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, হত্যার হুমকি, বয়কট-কিছুই যখন কাজ হলো না তখন ব্যর্থ, পরাজিত মানুষের মত বেপরোয়া, মরিয়া, অস্থির-উন্মাদপ্রায় কুরাইশরা গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলো।

হিজরতকারী মুসলিমগণের মদীনায় আগমনের ফলে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং মদিনাবাসীগণকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাতে সক্ষম হলে, তা হবে মক্কাবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। মুশরিকেরা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, কাজেই তারা এ চ্যালেঞ্জের

মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেল। এটা তাদের জানা কথা যে, এ বিপদের মূলসূত্র হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত। যার পতাকাবাহী হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাঃ।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ‘আক্কাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকারের আনুমানিক আড়াইমাস পর চতুর্দশ নবুওয়াত বর্ষের ২৬শে সফর দিবসের প্রথম ভাগে মক্কার সংসদ ভবন দারুন নাদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকগণ ইতিহাসের সব চাইতে ভয়াবহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশগোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয় ছিল, এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীকে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়। আবু জাহেল প্রস্তাব দিলো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে রাসূল সাঃ -কে হত্যা করা হোক। এর ফলে রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হলো বনু আবদে মানাফ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না এবং দিয়াত গ্রহণে রাজি হয়ে যাবে। মক্কার সংসদ এমনভাবে এক কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে দিনের মতো মূলতবী হয়ে গেল।

১৮.২ হিজরতের অনুমতি

মুশরিকদের পরিকল্পনা ছিল আল্লাহর রাসূল সাঃ -কে হত্যা করা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। জিবরাঈল আঃ মহান ও বরকতময় প্রভুর তরফ থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁকে কুরাইশ মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন এবং জানালেন যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন। রাসূল সাঃ তখন আবু বকর রাঃ -এর বাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানালেন এবং প্রস্তুত থাকতে বললেন।

১৮.৩ রাসূল সাঃ -এর গৃহত্যাগ

রাতের যখন এক তৃতীয়াংশ গত হলো, ধরনীতে নিস্তব্ধতা নেমে এল এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল- এমন সময় ১১ জন যুবক অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর বাড়িতে হাজির হলো। তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর ঘরের দরজায় অবস্থান করলো। রাসূল সাঃ আলী রাঃ -কে তাঁর কাছে থাকা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর বিছানায় আলী রাঃ -কে রেখে ঘরের বাহিরে বের হলেন এবং একমুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে আর দেখতে পেল না। এরপর তিনি আবু বকর রাঃ -এর গৃহে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন। এ পর্বত গুহায় তাঁরা উভয়ে তিন রাত্রি অবস্থান করলেন। আবু বকর রাঃ -এর পুত্র আবদুল্লাহও ঐ সময় একই সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। গুহায় আত্মগোপনকারীগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যে সকল ষড়যন্ত্র করত তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন।

১৮.৪ কুরাইশদের প্রচেষ্টা

এদিকে কুরাইশদের অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে হত্যার উন্মাদনায় উন্মত্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করার পর প্রভাতে যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, তিনি তাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তারা একদম দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং ক্রোধের আতিশয্যে ফেটে পড়তে চাইল। তাদের ক্রোধের প্রথম শিকার হলেন আলী রাঃ । তাঁকে টেনে হিঁচড়ে কা'বা গৃহ পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ তাঁর উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাল যাতে তার নিকট থেকে তাঁদের দুজনের সম্পর্কে খোঁজ খবর কিছুটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এরপর তারা আবু বকর রাঃ -এর গৃহে খোজ নিয়ে সেখান থেকেও বিফল মনোরথে ফেরত আসলো।

কুরাইশগণ একটি তড়িঘড়ি সভা করে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তাঁদের ধরার জন্য অনতিবিলম্বে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। ফলে মক্কা থেকে বেরিয়ে যে দিকে যত পথ গেছে সকল পথেই অত্যন্ত কড়া সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দেয়া হল এবং তাঁদের ধরে আনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। এই প্রচারণার ফলে বিভিন্ন বাহনারোহী, পদাতিক ও পদচিহ্নবিশারদগণ অত্যন্ত জোরে শোরে প্রান্তর, পর্বতমালা, শস্যভূমি, বিরান অঞ্চল সর্বত্রই তারা অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, কিন্তু ফল হল না কিছুই।

রাসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর রাঃ যে পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন অনুসন্ধানকারীগণ সে গুহার প্রবেশ পথের পার্শ্বদেশে পৌঁছে গেল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হিফাজত করলেন। কাজেই অনুসন্ধানকারীগণ সে সময় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলো যেখানে রাসূল সাঃ ও তাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক ফুটেরও কম।

১৮.৫ মদীনার পথে

তিনদিন যাবৎ নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর যখন কুরাইশদের অনুসন্ধান কাজের মাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবু বাকর (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। আমার বিন ফুহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত মদীনা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরলেন। সর্বপ্রথম সওর গুহা হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি ইয়ামেনের পথে যাত্রা করলেন এবং দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তার পরে পশ্চিমদিকে ঘুরে সমুদ্রোপকূলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরে এমন এক পথে নিয়ে গেলেন যে পথের সন্ধান সাধারণ লোকেরা জানত না। এরপর উত্তর দিকে মোড় নিলেন যে পথ লোহিত সাগরের খুব কাছাকাছি ছিল। এপথে খুব অল্প মানুষ চলাচল করত।

১৮.৬ মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ এবং আবু বকর রাঃ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাইড তাদেরকে পথ দেখিয়ে উপত্যকার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কুবায় বনু আমর ইবন আউফের কাছে নিয়ে যায়। সেদিন ছিল সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল। গনগনে রৌদ্রতপ্ত দুপুরে সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সাথে দেখা করার আশায়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনসারগণ প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে যেতেন। কিন্তু রোদের তাপ বেড়ে গেলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তাঁরা সকাল সকাল বাইরে গিয়ে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর দেখা না পেয়ে সেদিনের মতো ফিরে যান। এর মধ্যে এক ইহুদি মদীনার উঁচু দালানের উপর থেকে সাদা জামা পরিহিত রাসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর রাঃ -কে মদীনার দিকে হেঁটে আসতে দেখে চিৎকার করে উঠলো, 'হে আরবের লোকেরা! তোমরা যার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে তিনি চলে এসেছেন!' এ কথা শুনে আনসারগণ তাদের অস্ত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে যায়। অস্ত্র নিয়ে বরণ করাই ছিল তাদের রীতি। এটা দিয়ে আরো বোঝায় যে, আগত অতিথিকে তারা নিরাপত্তা দিতে ইচ্ছুক।

রাসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর রাঃ মদীনার বাইরে কুবা নামক জায়গায় আসামাত্র আনসারগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ কুবায় চৌদ্দ দিন ছিলেন, এর মধ্যে তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সেখানে থাকাকালীন সময়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে সংবাদবাহক পাঠান। এর প্রতিউত্তরে তাঁরা রাসূলুল্লাহর জন্য একটি বিরাট প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করে বলেন, 'আসুন, আপনি এখানে নিরাপদ এবং আপনাকে মান্য করা হবে।' রাসূলুল্লাহ মদীনাতে নিছক অতিথি হিসেবে যাননি বরং তিনি একজন নেতা হিসেবে সেখানে গিয়েছেন।

এদিকে আলী রাঃ মক্কায় তিন দিন অবস্থানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট লোকদের গচ্ছিত আমানত আদায় করার পর পদদলে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপর মদীনায় পৌঁছে তিনি কুবায় রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৮.৭ মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ

জুমআর সালাত শেষে নাবী সাঃ মদীনায় প্রবেশ করেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিরের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও প্রশংসার) গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। মানুষজন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, আবিসিনিয়ানরা তাদের বর্শা নাচাচ্ছিল। মহিলারা ছাদে দাঁড়িয়েছিল আর রাসূলুল্লাহকে একনজর দেখার জন্য বাচ্চারা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে তারা বরণ করে নেয় চমৎকার একটি নাশীদ গেয়ে, চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয় একটি সুর।

তালা'আল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মাদা'আ লিল্লাহি দা'

মদীনার প্রত্যেকেই চাইছিল রাসূলুল্লাহ যেন তাদের বাড়িতে থাকেন। তারা প্রত্যেকে তাদের বাসায় থাকার জন্য নবীজিকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ বনু নাজ্জারের সাথে থাকতে চান। কারণ বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর কাছাকাছি বনু নাজ্জারের কার ঘর আছে। আবু আইয়ুব আল আনসারী জানান তাঁর ঘর কাছাকাছি আছে। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।

কিছুদিন পর আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাঃ মদীনায় এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে উম্মুল মু'মিনীন সাওদা রাঃ, আয়েশা রাঃ, ফাতিমা রাঃ, উম্মুল কুলসুম রাঃ এবং উসামা

বিন যায়েদ রাঃ ও উম্মু আয়মান রাঃ -কে নিয়ে এসেছিলেন। নাবী তনয়া যাইনাব রাঃ মক্কায় তাঁর স্বামী আবুল আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় এসেছিলেন।

মদীনা তখন ছিল সংক্রামক উপদ্রুত এলাকা। সেখানে নিম্নভূমি দিয়ে লবণাক্ত পানি প্রবাহিত হতো। মদীনায় আবু বকর রাঃ ও বিলাল রাঃ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। সাহাবাদ্বয়ের জ্বরের সময় বলা প্রলাপের প্রেক্ষিতে রাসূল সাঃ দু'আ করলেন —

“হে আল্লাহ, আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার ‘সা’ ও ‘মুদে’ (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহফাহ’য় পৌঁছিয়ে দাও।”

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাঃ -এর দু'আ কবুল করলেন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো।

১৯. মদীনার জীবন : দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ

মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্যায়ঃ ইসলামী সমাজ নির্মাণের ও ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠা লাভের যুগ। এ পর্যায়ে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাহির থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালিয়েছে যাতে মদীনায় ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যুলক্বাদাহ মাসে হুদায়বিয়াহর সন্ধিতে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতে পারে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ঃ এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

২০. তৎকালীন মদীনার অবস্থা

মদীনায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে তুলতে হয়েছিল যাদের একগোষ্ঠী থেকে অন্যগোষ্ঠীর অবস্থা ছিল ভিন্ন। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন সাধারণ ছিল তেমনি তাদের মধ্যে অসংখ্য ভিন্নতা ছিল। সম্প্রদায় তিনটি হলো —

১. আনসার সাহাবীগণ

২. মদীনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুশরিক বেদুইন গোষ্ঠী

৩. ইহুদীগণ

(ক) আনসার সাহাবীগণঃ তৎকালীন মদীনায় দুটি আরব গোত্রের বসবাস ছিল— আল-আওস ও আল-খায়রাজ। উভয়ে ছিল কাহতানি আরবদের বংশধর। আনসার সাহাবীগণ তাঁদের নবাগত মুহাজির ভাইদের প্রতি যে সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল।

(খ) সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেদুইন গোষ্ঠীঃ মদীনার মূল পৌত্তলিক অধিবাসীরা এ সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিমগণের উপর এদের কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের কিছু সংখ্যক মানুষ স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং কিছু সংখ্যক মুশরিক অন্তরে অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাঃ ও মুসলিমগণের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

(গ) ইহুদীগণঃ মদীনার ইহুদীগণ আসিরীয় ও রোমিও বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হিজাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা ছিল জন্মগতভাবে হিব্রু ভাষাভাষী কিন্তু আরব ভূখণ্ডে বসবাসের কারণে তাদের চালচলন, ভাষা এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে আরবীয়দের মত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও তারা তাদের ইহুদি জাতীয়তাবাদী পরিচয় ছাড়তে পারেনি এবং আরবদের সাথে পুরোপুরি মিশে যেতে পারেনি। বরং তারা নিজেদেরকে ইহুদি ও ইসরায়েলি জাতীয়তাবাদের অনুসারী বলে দাবী করত এবং আরবদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে করত। তাদের ধারণা ছিল যে, আরবদের সম্পদ তাদের জন্য বৈধ আর এজন্যই আরবদের সম্পদ তারা যথেষ্টভাবে ব্যবহার করত। ইহুদীদের তিনটি গোত্র ইয়াসরিবে প্রসিদ্ধ ছিল—

(ক) বনু কাইনুকাঃ এরা মদীনার ঠিক মধ্যস্থলে থাকত এবং স্বর্ণালংকারের ব্যবসা করত। তারা ছিল খাজরায় গোত্রের মিত্র। এদের প্রধান ব্যবসা ছিল স্বর্ণালংকার ব্যবসা।

(খ) বনু নাযিরঃ এরা থাকতো মদীনার এক পাশে। এরাও ছিল খাজরায় গোত্রের মিত্র।

(গ) বনু কুরাইযাঃ এরাও মদীনার এক পাশে বনু নাজিরের কাছাকাছি থাকত। এরা আওস গোত্রের মিত্র ছিল।

অর্থোপার্জনের নানা পন্থা প্রক্রিয়া ও কৌশলাদির ব্যাপারে ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তারা খাদ্যশস্য, বস্ত্র, মদ ইত্যাদি আমদানী করত এবং খেজুর রপ্তানী করত। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা আরবদের নিকট থেকে অত্যন্ত উচ্চ হারে মুনাফা আদায় করত। শুধু তাই নয়, তারা চড়া সুদে সুদী কারবারও করত। কুচক্র, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে ইহুদীরা ছিল সিদ্ধহস্ত। তারা এত সূক্ষ্ম কূটকৌশলের সাথে বিভিন্ন গোত্রগুলোর মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ বাধিয়ে দিত যে কেউ কিছু টের পেত না। আর তাদের সংঘর্ষ চলতে থাকত যুগ যুগ ধরে। ইহুদীরাই বিভিন্ন গোত্রের মাঝে শত্রুতা নির্বাপিত হতে দেয়নি বরং যুগ যুগ ধরে শত্রুতার আগুনকে জ্বালিয়ে রেখে তারা ফায়দা লুটেছে। ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সংক্ষেপে

বলা যায় যে, তারা কখনই মুসলিমগণকে সুনজরে দেখত না। তারা সর্বদাই মুসলিমগণের ব্যাপারে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন থাকত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সঙ্গে তাদের গোত্রীয় কিংবা বংশজাত কোন সম্পর্কই ছিল না।

২১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মদীনায় পৌঁছে রাসূল সাঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চারটি প্রোজেক্ট হাতে নেন। এগুলো হলো ধর্মীয় প্রোজেক্ট, সামাজিক প্রোজেক্ট, রাষ্ট্রীয় প্রোজেক্ট এবং সামরিক প্রোজেক্ট।

২১.১ ধর্মীয় প্রোজেক্ট

কুবায়ে পৌঁছেই রাসূল সাঃ যেমন প্রথমেই মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, মদীনায় পৌঁছেও তিনি তা-ই করলেন। মসজিদ শুধু মুসলিমদের ইবাদতের জায়গাই নয় বরং গোটা মুসলিম সমাজের শিক্ষাকেন্দ্র। মক্কায় মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না বিধায় দারুল আরকাম এ মুসলিমদের প্রশিক্ষণ ও তা'লিমের কাজ চলত। কিন্তু এখন মদীনায় এসে দারুল আরকামের কাজটি শুরু করল মসজিদে নববী। পার্থক্য হলো, যেহেতু সেটি একটি কুফর এবং শির্কে নিমজ্জিত সমাজ ছিল তাই দারুল আরকামে মুসলিমদের কার্যক্রম ছিল গোপনে। কিন্তু মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিলনা। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী'।

মসজিদে নববী নির্মাণ—

যেখানে সর্ব প্রথম রাসূল সাঃ -এর উটটি বসে পড়েছিল সেখানেই মসজিদের জন্য জায়গা নির্ধারিত হলো। এ স্থানটির মালিক ছিল দু'জন অনাথ বালক। তিনি ঐ স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন,

‘হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালেরই জীবন। অতএব আনসার ও মহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন।’

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর কর্মধারা সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করছিল। তাঁরাও বলছিলেন, “যদি আমরা বসে থাকি এবং নাবী সাঃ কাজ করেন, তবে আমাদের এ কাজ হবে পথভ্রষ্টতার”

এ জমিতে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক কবর ছিল। কিছু অংশ পতিত ছিল। তাছাড়া খেজুর ও গারকাদের কয়েকটি গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেন, অসমতল জায়গাটা সমতল করলেন এবং খেজুর ও অন্য গাছগুলো কাটিয়ে ক্বিবলাহর দিকে খাড়া করে দিলেন। সে সময় ক্বিবলাহ বায়তুল মুকাদ্দাস। দরজার দু’বাহুর স্তম্ভগুলো পাথর দ্বারা এবং দেওয়াল নির্মিত হল কাঁচা ইট দিয়ে। ছাদের উপর খেজুরের ডালপালা চাপিয়ে আবরণ তৈরি করা হল আর খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে থাম তৈরি করা হল। মেঝেতে বিছানো হল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। ঘরের তিন দরজা লাগানো হয়েছিল। মসজিদটি ছিল খুব সাদামাটা কিন্তু এটি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম এবং সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন।

মসজিদে নববী শুধুমাত্র সালাত আদায়ের স্থানই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। এ মসজিদেই ছিল মুসলিম সামাজ্যের আদিশিক্ষা কেন্দ্র যেখানে বসে মুসলিমগণ ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাদিক্ষা এবং হেদায়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন, এ মসজিদেই ছিল এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে জাহেলিয়াত জীবনের দীর্ঘ কালের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা হয়েছিল, এ মসজিদেই হতো রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শ সভা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ মসজিদে নববী।

উন্মুল মু'মিনীন_দের কক্ষ নির্মাণ—

রাসূলুল্লাহ সাঃ মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন যার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুরের গুঁড়ির বর্গা দিয়ে। ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে তৈরি। এগুলো ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন নাবী পত্নীগণের রাঃ আবাস কক্ষ। এ কক্ষগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাঃ আবু আইউব আনসারী রাঃ -এর বাসা থেকে এ আবাসস্থানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।

উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের নির্দেশে উন্মুল মু'মিনীনদের সমস্ত কামরা ভেঙে ফেলা হয় এবং সম্পূর্ণ এলাকা মসজিদে নববীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাহল বিন হানিফ রাঃ বলতেন, "এ কামরাগুলো যেভাবে নির্মিত হয়েছিল সেভাবেই যদি রেখে দেওয়া হতো তাহলে মানুষ এ ঘরগুলো দেখতে এবং উপলব্ধি করতে পারত, যে নবীর হাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সারা দুনিয়ার সম্পদ রাশির চাবিকাঠি, তিনি কেমন কামরাগুলোতে তাঁর জীবন কাটিয়ে গেছেন"।

আহলুস-সুফফা—

যখন কিবলা উত্তর দিক, অর্থাৎ জেরুজালেম বরাবর ছিল তখন মসজিদে নববীর পাশে ছায়ার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। সেই ছাউনিটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আহলুস-সুফফা। আস-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাঁদের দেখাশোনার জন্য কোনো পরিবার অথবা সম্পদ ছিল না। তাই তাঁরা সেখানে থাকতেন এবং রাসূল সাঃ -এর নিকট থেকে দ্বীন শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। যারা সেখানে থাকতেন তাঁদের সবাই যে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতেন- বিষয়টি তেমন নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলুস-সুফফায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমন একজন সাহাবী ছিলেন আবু হুরাইরা রাঃ। তাঁর সম্পদ ছিল কিন্তু তিনি পড়াশোনা করে দিন কাটাতে

ভালোবাসতেন। আবু হুরাইরা প্রথমদিকের সাহাবী ছিলেন না। তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারপরেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাজির ও আনসারগণ যখন ব্যবসা ও ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন তিনি ক্ষুধা পেটে রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে অনুসরণ করতেন। আবু হুরাইরা রাঃ রাতের সময়কে তিনটি অংশে বিভক্ত করতেন— এক অংশ ছিল ঘুমানোর জন্য, আরেক অংশ ইবাদতের জন্য বরাদ্দ এবং অন্য অংশে সারাদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে যত হাদীস শুনেছেন তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেন।

আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাদের ভরণপোষণের একটি উৎস ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পাঠানো সাদাক্বাহ। তিনি কোনো উপহার পেলে নিজের জন্য কিছু রেখে বাকিটুকু সুফফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি ধনী সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন যেন তাঁরা আস-সুফফার অধিবাসীদের নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়।

আযানের সূচনা—

মসজিদে নববীর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কিভাবে সবাইকে সালাতের দিকে ডাকা যায় সেই বিষয়ে। কেউ পরামর্শ দিল খ্রিস্টানদের মতো ঘন্টা ব্যবহার করার জন্য, কেউ বলল ইহুদীদের মত বিউগল ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু কোন প্রস্তাব রাসূল সাঃ -এর পছন্দ হল না। এমন সময় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাঃ একদিন স্বপ্নে দেখলেন- একটি লোক ঘন্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ঘন্টাটির মূল্য জানতে চাইলেন। লোকটি ঘন্টা নিয়ে চাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাঃ বললেন, এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের জন্য ডাকব। লোকটি বলল, এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ রাঃ জানতে চাইলেন, সেটি কী? লোকটি তখন তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিল। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাঃ এই স্বপ্নের কথা রাসূলকে জানালেন আর একই সাথে উমার রাঃ-ও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাসূল সাঃ বুঝতে পারলে যে এটি সত্য স্বপ্ন। তিনি আবদুল্লাহ রাঃ কে

বললেন বিলালকে এই আযানের কথাগুলো শিখিয়ে দিতে এবং বিলাল মসজিদে নববীতে প্রথমবারের মতো আযান দিলেন। আর এভাবেই আজানের সূত্রপাত হলো।

২১.২ সামাজিক প্রোজেক্ট

০ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা—

মুহাজির ও আনসারগণ কেউ কাউকে চিনতেন না, তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে কোন সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একই দ্বীনের অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁদের মধ্যে আল্লাহ এক প্রকার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। মুহাজির ও আনসারদের এই ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়ে আল্লাহ বলেন-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।

(সূরা আল আনফাল, ৮:৬৩)

‘মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্বের’ মূলনীতি গুলো ছিল, ‘একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ও চুক্তি ছিল—

মদীনার আরবদের সাথে মুসলিমদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মদীনায় আগমনের পর মুসলিমদের সাথে আহলে কিতাবদের সম্পর্ক কেমন হবে তা আল্লাহ আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন-

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালামদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা মায়িদা, ৫:৫১)

এভাবে মদিনায় ইসলাম আসার পরে জাহেলী যুগের প্রতিটি সম্পর্ক বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো এবং এক কালিমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ -এর ভিত্তিতে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হল। যারা এই কালিমা মেনে নিয়েছে তারা এক ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছে এবং যারা এটা মেনে নেয়নি তারা ঈমানের ক্যাম্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরের ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছে। এভাবে আল্লাহ মুসলিমদের সাথে কাফিরদের সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিমদেরকে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিলেন। আর এই বন্ধনের কারিগর হিসেবে রাসূল সাঃ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

২১.৩ রাজনৈতিক প্রোজেক্ট

০ মদীনা সনদ—

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূলুল্লাহ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে, কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে, কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।

০ ধারাসমূহ—

এটা লিখিত হচ্ছে নাবী মুহাম্মাদ সাঃ -এর পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরেবী এবং তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণের জন্যঃ

১. এরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মানব থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠি।
২. কুরাইশ মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত (হত্যার বিনিময়) দেবেন এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দীদের মুক্তিপণ প্রদান করবেন। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত প্রদান করবেন এবং তাঁদের সকল দল ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আপন বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবেন।
৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীন (অনাথ) কে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা মোতাবেক প্রদান এবং সম্মান করা থেকে বিমুখ করবেন না।
৪. সকল ধর্মপ্রাণ মু'মিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে অথবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গন্ডগোলের পথ বেছে নেবে।
৫. মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।
৬. কোন কাফিরের বদলে কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবেন না।
৭. কোন মু'মিন কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবেন না।
৮. আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত যিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।
৯. যে সকল ইহুদী মুসলিমগণের অনুগামী হবে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমগণের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।
১০. মুসলিমগণের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবেন না, বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবেন।

১১. মুসলিমগণ ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবেন যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১২. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোন মু'মিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে যদি নিহতের অভিভাবক রাজী থাকেন।

১৪. যে সকল মু'মিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কিছু হালাল হবে না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁরা বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন।

১৫. কোন মু'মিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গুন্ডগোল সৃষ্টি করে (বিদ'আতী) তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা তাকে আশ্রয় দেয়, কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেয়। যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গযবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই যে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাঃ -এর বিধি-বিধান মতো ফয়সালার ব্যবস্থা করবে।

০ মদীনা সনদ : কিছু পর্যালোচনা

১। মদীনা সনদের মাধ্যমে গোত্রভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে আকীদাহ বা ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ইতিপূর্বে আরবদের পরিচয় ছিল গোত্রভিত্তিক, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা ঐক্য বজায় রাখতো। এ সনদের মাধ্যমে রাসূল সাঃ গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে 'উম্মাহভিত্তিক' সমাজ ব্যবস্থা দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেন।

২। মদীনা সনদ অনুসারে মদিনার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক ও ফৌজদারি সকল বিষয়ের নিষ্পত্তিতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাঃ -এর রায় চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ মদীনা হয়ে গেল ইসলামী শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্র এবং রাসূল সাঃ হলেন তার রাষ্ট্রপ্রধান।

৩। মদীনা সনদের মাধ্যমে ইহুদি ও মুসলিমদের সম্পর্কের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়।

২১.৪ সামরিক প্রোজেক্ট

○ মুজাহিদ বাহিনী গঠন—

মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাঃ যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে প্রচলিত সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে বেসামরিক যোদ্ধা- তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) মুসলিম হওয়া

২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকা

৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না

৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা; কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহ সাঃ কিংবা মদীনার তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

০ প্রশিক্ষণ—

রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাহাবিরা শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ ছিলেন, তাঁরা যে ধরনের কাজ করতেন তাতে তাঁদের যথেষ্ট শারীরিক দক্ষতা ছিল। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল। যেমন, মক্কা ও মদীনার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল না, তাই তাঁরা সাঁতার জানতেন না। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে তীর চালনা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানারকম সামরিক দক্ষতায় দক্ষ করে তুলছিলেন। একই সাথে রাসূলুল্লাহ সাঃ জিহাদের জন্য তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

২২. ইহুদীদের সাথে চুক্তি

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নাবী কারীম সাঃ যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানবী সাঃ -এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও প্রকাশ্য কলহ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার হাবভাবও প্রকাশ করে নি। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন

অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি। এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদীনা এবং সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক শান্তি-স্বস্তিময় সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে যার রাজধানী ছিল মদীনা এবং সর্বময় নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ। এ সাম্রাজ্য পরিচালনার ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হুকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়।

২৩. কুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচি

রাসূল সাঃ মদীনায় হিজরতের পরপরই কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে চিঠি লিখে, যার সার সংক্ষেপ ছিল—

‘তোমরা আমাদের কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোককে আশ্রয় দিয়েছ, এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, হয় তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাদের দেশ থেকে তাদেরকে বহিস্কার করে দেবে, অন্যথায় সদলবলে তোমাদের উপর ভীষণভাবে আক্রমণ পরিচালিত করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা এবং মহিলাদের মান হানি করব।’

এমন আরো একটি ঘটনা ঘটে যখন সা'দ বিন মুয়ায কা'বা তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় যান। তখন তিনি উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে দেখা করেন। উমাইয়্যা ইবন খালাফের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব জাহেলিয়াতের সময় থেকেই। তিনি উমাইয়্যাকে কাবা তাওয়াফ করার জন্য সুবিধাজনক সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। যখন কাবায় লোকজন কম থাকবে তখন তিনি তাওয়াফ করতে চাচ্ছিলেন। তাঁরা কিছুটা দেরিতে তাওয়াফ করলেন। কিন্তু আবু জাহেল তাদের দেখে ফেললো। তখন সে উমাইয়্যাকে

জিঞ্জেস করলো, 'তোমার সাথে থাকা লোকটি কে?' উমাইয়্যা সা'দ বিন মুয়াযের পরিচয় দেয়ার পর আবু জাহেল উমাইয়্যাকে বললো, 'তুমি তাঁকে কাবা তাওয়াফ করতে সাহায্য করে কাজটা ঠিক করোনি, কারণ তাঁর গোত্রের লোকেরাই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছে।' তখন সা'দ বিন মুয়ায আবু জাহেলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দেখো, তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দাও, তাহলে তোমাদের কাফেলাকেও আমি চলাচলে বাধা দেবো।' কুরাইশদের কাফেলাগুলোকে মদীনা হয়ে যেতে হতো, তাই সা'দ তাকে কাফেলা আটকানোর হুমকি দেন।

কুরাইশ মুশরিকগণ মদীনার মুহাজিরদেরকে ধমকের সুরে বলে পাঠাল, 'মক্কা হতে তোমরা নিরাপদে ইয়াসরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড় না যেন। এটুকু জেনে রেখ যে, ইয়াসরিবে চড়াও হয়েই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।' তাদের এ ধমক শুধু যে কথাবার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ ব্যাপারে তারা গোপনে গোপনে তৎপরও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, তিনি সতর্কতা অবলম্বন না করে পারেন নি। নিরাপত্তার খাতিরে হয় জাগ্রত অবস্থায় তিনি রাত্রি যাপন করতেন, নতুবা সাহাবীদের প্রহরাধীনে ঘুমোতেন।

এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কুরাইশরা অনবরত বিভিন্ন উপায়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ ও তাঁর সাহাবাদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতো। নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে এ জাতীয় হুমকি ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিকীকরণের খুব প্রয়োজন ছিল।

২৪. যুদ্ধের অনুমতি

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্রোহপরায়ণতা ও একগুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন, ‘ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।’ (আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

২৫. সামরিক অভিযানের শুরু

গাযওয়া — রাসূল সাঃ -এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযান।

সারিয়া — সাহাবীদের নেতৃত্বে রাসূল সাঃ -এর পাঠানো সৈন্যদল।

রাসূল সাঃ মদীনায় হিজরতের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত মাত্র ১০ বছর সময়ে ২৭টি যুদ্ধ নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সারিয়া পাঠিয়েছিলেন ৩৭টি।

১. সারিয়াতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী

২. সারিয়াতু রাবিগ

৩. সারীয়ায়ে খারার

৪. গাযওয়ায়ে আবওয়া

৫. গাযওয়ায়ে বুওয়াত

৬. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান

৭. গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহ

৮. নাখলাহ অভিযান

ছোট ছোট এসব সামরিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল চারদিকে রাসূল সাঃ এবং মুসলিমদের উপস্থিতি জানান দেয়া। রাসূল সাঃ বিভিন্ন জায়গায় সারিয়া পাঠিয়ে সবাইকে একটি সূক্ষ্ম বার্তা পাঠিয়ে দিলেন যে, মুসলিমদের একটি সামরিক শক্তি আছে এবং

তাঁরা তা ব্যবহার করতে সক্ষম। বেশ কিছু সারিয়া -এর পর এ বিষয়টি কুরাইশদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছা করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্ধত আচরণ থেকে বিরত রইল না।

২৬. কিবলার পরিবর্তন

দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা গৃহকে কিবলা নির্ধারিত করলেন এবং নামাযে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। কিবলা পরিবর্তন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস বরাবর; তখন কিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুজালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাঃ কা'বা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে মুসলিমদের কিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাঃ নতুন কিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে কিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো কিবলা অর্থাৎ জেরুজালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ

সালাতের মধ্যেই নিজেদের কিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর প্রতি সাহাবীদের প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনায় যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হলেন তা হচ্ছে, যে সকল মুনাফিক ইহুদী মুসলিমদের মধ্যে শুধু ফাটল ধরানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সারিতে এসে দাঁড়াত তাদের মুখোশ খুলে গেল। তারা এখন মুসলিমদের মধ্যে থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেদের আসল অবস্থানে ফিরে গেল।

২৭. বদরের যুদ্ধ

২৭.১ পটভূমি

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের সবচেয়ে বড় কাফেলাকে আশ-শামের উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর খবর সংগ্রাহকদের মাধ্যমে নিয়মিত শত্রুপক্ষের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতেন। কাফেলার খবর পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ সাঃ খোঁজ নেওয়ার জন্য গুপ্তচর পাঠান। তিনি খবর সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে সেই কাফেলার অবস্থান জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ যাদের সাথে সেই মুহূর্তে চড়ার মতো বাহন প্রস্তুত আছে, তাদের নিয়ে দ্রুত রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রস্তুতির জন্য তিনি আলাদাভাবে সময় নষ্ট করতে চাননি। এ কারণেই এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। মুসলিমদের মধ্যে সেই সময় যুদ্ধ করার মতো অন্তত ১৫০০ লোক গণনা করা হয়েছিল, কিন্তু এই অভিযানে অংশ নিতে পেরেছিল মাত্র ৩১৭ জন, মতান্তরে ৩১৯ জন।

আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ কাফেলাটি দখল করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এদিকে আবু সুফিয়ান বেশ সতর্ক ছিল এবং সে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য গোয়েন্দা পাঠায়। কারণ এর আগে ঘনঘন বেশ কিছু কাফেলা আক্রমণ হওয়ায় আবু জাহেল তার লোকদের মুহাম্মাদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করে

দিয়েছিল। আবু সুফিয়ান বদরে পৌঁছে যায়, বদর আর মদীনার দূরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। বদরে পৌঁছে সে উটের বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গুঁড়ো করে পরীক্ষা করলো। সে এই বিষ্ঠা দেখে বুঝে গেলো যে, এই বিষ্ঠা মদীনার খেজুর খাওয়া উটের বিষ্ঠা। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মদীনা থেকে তার কাফেলার উপর নজরদারি চলছে। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কাছে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করলো এবং কাফেলা রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালো। রাসূলুল্লাহ সাঃ আবু সুফিয়ানের কাফেলা দখল করার জন্য বদর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেই ওই স্থানে পায়চারি করে দেখছিল কোথায় কী আছে। সে বদরের কুয়াগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, কারা এই কুয়াগুলো থেকে পানি তুলেছে?' তাঁরা বললো যে, তারা দুইজন অপরিচিত লোককে দেখেছে। সে তৎক্ষণাৎ কাফেলার দিক পরিবর্তন করে উপকূলের দিকে প্রবল বেগে পালিয়ে গেল। ফলে সে মুসলিমদেরকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। সে মক্কার লোকদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে, কাফেলা এখন নিরাপদ, আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আবু জাহেল তাতে রাজি হলো না। তারা কাফেলা রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু কাফেলা নিরাপদ— এই খবর পাওয়ার পরও তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল থাকে। মুসলিমদের শেষ করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

২৭.২ মুসলিমদের শূরা

কুরাইশদের যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কাফেলা ইতোমধ্যেই নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে যায়, কিন্তু তবু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য আর অহংকার প্রকাশের জন্য বের হয়েছিল। তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে দস্ত করছিল। রাসূল সাঃ বুঝতে পারলেন, কাফেলাটি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে

কাফেলার ৪০ জনের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ শূরা ডাকলেন আর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এ ব্যাপারে কে কী ভাবছেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, উমারও একই কথা বললেন। এরপর দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ , আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার জন্য অগ্রসর হোন। বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল, মূসা, তুমি তোমার রবকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখান থেকে নড়ছি না। কিন্তু আমরা আপনাকে কখনোই এমন কথা বলব না। আমরা যুদ্ধ করবো আপনার সামনে থেকে, আপনার পেছন থেকে, আপনার ডানে দাঁড়িয়ে এবং আপনার বামে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার রবকে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার সাথে আছি।”

—একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি উৎসাহের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। মিকদাদের এই কথাগুলো ছিল সাহাবাদের জন্য প্রেরণা। কিন্তু সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণ করতে, বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াবার জন্য নয়। কিন্তু আল্লাহরও পরিকল্পনা ছিল, আর আল্লাহর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ চাননি এই যুদ্ধ হোক নিছক মুহাজিরদের সম্পদ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ, তিনি চেয়েছেন আরো বড় কিছু। তিনি চেয়েছেন এই যুদ্ধে হক্ক ও বাতিলের আদর্শ মুখোমুখি হোক আর তিনি হক্ককে জয়ী করেন এবং মিথ্যাকে পরাজিত করেন। তিনি পরিস্থিতিতে এমনভাবে বদলে দেন যে, মুসলিমদের এই যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর একারণে এই দিনকে বলা হয় 'ফুরক্কানের দিন' বা 'সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন'।

২৭.৩ মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাঁদের নেতৃত্বের বিন্যাস

রাসূলুল্লাহ সাঃ বদর অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী রাঃ। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন এ রকম কোন প্রস্তুতিই রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর বাহিনীর ছিল না। এমনকি যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিন শতাধিক লোক বিশিষ্ট এ বাহিনীর জন্য মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। উট ছিল সত্তরটি, এক এক উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন দুই কিংবা তিন জন লোক।

সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় যুবাইর ইবনু 'আওয়াম রাঃ -কে এবং বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিকদাদ ইবনু 'আমর রাঃ -কে। কারণ, সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র এ দুজনই ছিলেন অশ্বারোহী। সেনাবাহিনীর পশ্চাভাগের দলপতি নিযুক্ত হন ক্বায়স ইবনু আবী সা'সা'আহ রাঃ আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ স্বীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত পথে চলার নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা মুশরিক বাহিনীর পূর্বেই বদরের প্রস্রবণের নিকট পৌঁছে যান এবং প্রস্রবণের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুশরিক বাহিনী যাতে কোনভাবেই প্রস্রবণের উপর অধিকার লাভ করতে না পারে সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেখানে পৌঁছানোর পর প্রস্রবণের উপর মুসলিম বাহিনীর যখন শিবির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হল তখন সা'দ ইবনু মু'আয রাঃ প্রস্তাব করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সৈন্য পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদানের কেন্দ্রস্থল রূপে একটি ছাউনী নির্মাণ করে দেয়া হোক, যেখানে তিনি অবস্থান করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা ইশারা করে করে যাচ্ছিলেন, 'এটা হবে ভাবীকাল ইনশাআল্লাহ অমুকের বধ্যভূমি এবং এটা আগামী কাল হলে ইনশাআল্লাহ অমুকের বধ্যভূমি।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ সেখানে একটি গাছের মূলের পাশে রাত্রি যাপন করেন এবং মুসলিমরাও পূর্ণ শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করেন। তাঁদের অন্তর আল্লাহর উপর ভরসায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের এ আশা ছিল যে, প্রত্যুষেই তাঁরা স্বচক্ষে প্রতিপালকের শুভ সংবাদের

বাণী দেখতে পাবেন। রাতটি ছিল হিজরী ২য় সনের ১৭ই রমাযানের জুমুআহর রাত।
ঐ মাসেরই ৮ই অথবা ১২ই তারিখে রাসূলুল্লাহ সাঃ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

২৭.৪ যুদ্ধমঞ্চ : বদর

এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ছিল আসওয়াদ ইবনু আবুল আসাদ মাখযুমী। হঠকারী এ লোকটি জেদ করলো, মুসলিমদের হাউয়ের পানি পান করবে এবং সেদিকে এগিয়ে চললো। হাউয়ের পাড়ে হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব রাঃ -এর সাথে তার মুখোমুখি হলো। হামযাহ রাঃ তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করলেন, এতে তার পা অর্ধ পদনালী হতে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাঁটুর ভরে ছেঁচড়িয়ে চলে হাউয়ের দিকে অগ্রসর হলো এবং তাতে প্রবেশ করতেই যাচ্ছিলো। ইতোমধ্যে হামযাহ রাঃ দ্বিতীয়বার তার উপর তরবারী চালালেন এবং সে মারা গেলো।

এটা ছিল এ যুদ্ধের প্রথম হত্যা। এর ফলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীর পুরুষরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে অন্যপক্ষকে সমরে আহ্বান করত। তখন ঐ পক্ষের নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এ আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্যে বীরদর্পে অগ্রসর হতো। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। উতবা ইবন রাবিয়াহ, তাঁর ছেলে আল ওয়ালিদ ও তার ভাই শায়েবা - কুরাইশদের মধ্য থেকে এই তিনজন দাঁড়িয়ে গেল। তারা মুসলিমদের দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনসারদের মধ্য থেকে তিনজন এগিয়ে যান। কুরাইশরা তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, ‘আমরা আনসার’। তখন তারা বলল, ‘আপনাদের আমরা চাচ্ছি না। আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের চাচ্ছি এবং একজন চিৎকার করে বলতে লাগল ‘হে মুহাম্মাদ সাঃ, মদীনার এ চাষাগুলোর সাথে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক। আমাদের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও।’ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ এ তিনজন আনসার বীরকে তাদের স্ব- স্ব স্থানে ফিরে যেতে বললেন। তারপর তিনি নিজের পরমাত্মীয়দের মধ্যে হতে হামযাহ রাঃ,

উবাইদাহ বিন হারিস রাঃ ও আলী রাঃ -কে সম্বোধন করে বললেন, ‘তোমরা তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হও।’ হামযাহ রাঃ এবং আলী রাঃ দুইজনই খুব দ্রুততার সাথে তাঁদের প্রতিপক্ষকে খতম করে দেন। কিন্তু উতবা আর উবাইদা দু'জন দু'জনকে আঘাত করেন এবং দু'জনই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন আলী এবং হামযাহ এসে উতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন।

যুদ্ধের শুরুতেই তিনজন বিখ্যাত অশ্বারোহী নেতাকে হারিয়ে কুরাইশরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে একত্রিতভাবে মুসলিমগণকে আক্রমণ করল।

রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর বাহিনী সাজালেন, লড়াইয়ের স্থান বাছাই করলেন, তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন একে একে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জাগতিক সকল প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করে এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করে দু'আ করলেন। এটিই হলো তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ সাঃ এক পাশে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। তিনি খুব গভীরভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। তিনি বললেন,

“হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো, তা পূরণ করো। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন করছি। তা না হলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদাত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।”

রাসূলুল্লাহ সাঃ এমনভাবে দু'আ করছিলেন, একসময় তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ে গেলো। তাঁর দীর্ঘ দু'আর পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন—

"আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৯)

এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

“তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে উঠে যাও যার প্রস্থ আসমান ও যমীনের সমান।”

মুসলিমরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন এবং ফিরিশতারাও তাঁদেরকে সাহায্য করলেন। ইকরামা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘ঐ দিন মানুষের মস্তক কেটে পড়ত, অথচ কে কেটেছে তা জানা যেত না এবং মানুষের হাত কতিত হয়ে পড়ে যেত, অথচ কে কতন করেছে তা জানা যেত না।’

আবু দাউদ মাযেনী বলেন, ‘আমি একজন মুশরিককে মারার জন্যে তাড়াতাড়ি করছিলাম। অকস্মাৎ তার মস্তকটি, আমার তরবারী ওর উপর পৌঁছার পূর্বে কেটে পড়ে যায়। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, তাকে আমি নই, বরং অন্য কেউ হত্যা করেছে।’

অল্প সময়ের মধ্যেই মুশরিকদের সৈন্য বাহিনীতে অকৃতকার্যতা ও দুর্ভাবনার বিভিন্ন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। মুসলিমদের কঠিন এবং অবিরাম আক্রমণের কারণে তারা দৌঁড় দিয়ে পিছু হটতে লাগল। এ সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদের হত্যা, জখম ও বন্দী করতে করতে পিছু পিছু ধাওয়া করে চলল। এমনকি দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল।

আবু জাহেল যখন সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রত্যক্ষ করল তখনও সে নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় থাকার মনস্থ করল। কাজেই সে নিজ দলের সৈন্যগণকে উচ্চ কণ্ঠে এবং আত্মস্তরিতার সঙ্গে বলতে থাকল যে, ‘লাত ও উযযার শপথ! তাদেরকে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করব না। দেখ, তোমাদের কোন ব্যক্তি তাদের কাউকেও যেন হত্যা না করে। আমরা যেন তাদেরকে অন্যায়ের শাস্তি দিতে পারি এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধর এবং বন্দী কর।’ কিন্তু তার তর্জন গর্জন অসারে পরিণত হলো। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিমদের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল।

আব্দুর রহমান বিন আওফ হতে বর্ণিত আছে যে, ‘বদরের যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ ডানে এবং বামে অল্প বয়স্ক দুজন যুবককে দেখতে পেলাম। তাদের উপস্থিতিতে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এমন অবস্থায় ওদের একজন তার সঙ্গীকে এড়িয়ে আমার কাছে এসে বলল। ‘চাচাজান আবু জাহেল কোনটি, আমাকে দেখিয়ে দিন।’ আমি বললাম, ‘ভাতিজা, তাকে তোমার কী প্রয়োজন।’ সে বলল, ‘আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে মন্দ বলেছে। সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে অবধারিত হয়েছে সে মৃত্যুবরণ না করবে ততক্ষণ আমার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক হবে না।’ দ্বিতীয় জনও এসে ইঙ্গিতে আমাকে ঐ একই কথাই বলল। তারপর আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, আবু জাহেল লোকজনদের মাঝে চক্রর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আরে দেখছ না, ঐ যে, তোমাদের শিকার যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে।’ তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ‘এ কথা শোনা মাত্র তারা উভয়ে তরবারী নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল এবং সেই কুখ্যাত নরাধমকে হত্যা করে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট প্রত্যাবর্তন করল।’

আবু জাহেলের এ দু’হত্যাকারীর নাম হল, মু’আয বিন ‘আমর বিন জামুহ এবং মু’আয বিন আফরা। রাসূলুল্লাহ সাঃ আবু জাহেলের মৃতদেহ দেখে বললেন, ‘ঐ ব্যক্তি এ উম্মতের ফিরাউন।’

২৭.৫ যুদ্ধের ফলাফল

এ যুদ্ধ মুশরিকদের প্রকাশ্য পরাজয় এবং মুসলিমদের সুস্পষ্ট বিজয়ের উপর সমাপ্ত হয়। এতে ১৪ মুসলিম শহীদ হন, ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার। কিন্তু মুশরিকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাফেরদের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয়। নাবী সাঃ -এর আদেশক্রমে বদরের দিন কুরাইশদের ২৪

জন বড় বড় নেতার মৃত দেহ বদরের একটি পরিত্যক্ত, নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহেল সহ ১৪ নেতার ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুতব'ইম ও হাকীম বিন হেযাম পরে মুসলমান হন।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাঃ বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ সব মাল তার নিকটে জমা করতে বলেন। অতঃপর বদর থেকে রওনা হয়ে একটি টিলার উপরে যাত্রাবিরতি করেন এবং সেখানে বসে গনীমতের সমস্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন।

রাসূল সাঃ -এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং সাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান। কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবু বকর রাঃ তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেইসাথে সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে অল্প দিনের মধ্যে এদের সবার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করাও সম্ভব হবে। কিন্তু উমর ফারুক রাঃ স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দেন। আবুল 'আস সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন। আবুল 'আস ছিল খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল কন্যা যয়নবের স্বামী। কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূল সাঃ -এর আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে নযীর বিহীন।

২৮. বদর যুদ্ধ পরবর্তী বিচ্ছিন্ন ঘটনা

হিজরী ২য় সনে রমায়ানের রোযা এবং সাদকায়ে ফিতর ফরজ করা হয়, আর যাকাতের বিভিন্ন নিসাব নির্দিষ্ট করা হয়। সাদকায়ে ফিতর ফরজ ও যাকাতের নিসাব নির্দিষ্ট করণের ফলে ঐ বোঝা ও কষ্ট অনেকাংশ হালকা হয়ে গেল যা বহু সংখ্যক দরিদ্র মুহাজির বহণ করে আসছিলেন। তারপর মুসলিমরা তাদের জীবনে প্রথম ঈদ উদযাপন করেছিলেন ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঈদ, যা বদর যুদ্ধের প্রকাশ্য বিজয়ের পর হাজির হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং মুশরিকদের মধ্যে সর্ব প্রথম অস্ত্রের লড়াই এবং মীমাংসাসূচক সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে মুসলিমগণ প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেন এবং সমগ্র আরব তা প্রত্যক্ষ করে। এ যুদ্ধের ফলে মক্কার মুশরিকেরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, মর্মান্বিত হয়েছিল সব চাইতে বেশী। তাছাড়া ঐ সকল লোকও যারা মুসলিমদের বিজয় ও সফলতাকে নিজেদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল, অর্থাৎ ইহুদীরা। সুতরাং মুসলিমগণ যখন বদর যুদ্ধে কল্পনাভীতভাবে বিজয় লাভ করলেন তখন এ দুটি দল মুসলিমদের প্রতি ক্রোধ, ক্ষোভ ও পীড়ায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল।

মদীনায় কিছু লোক এ দুটি দলের সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তারা যখন দেখল যে, তাদের মান মর্যাদা সমুন্নত রাখার এখন আর কোন পথ রইল না তখন তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করল। এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার বন্ধু বান্ধবের দল। ইহুদী এবং মুশরিকদের তুলনায় মুসলিমদের প্রতি এরাও কম ক্ষোভ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত না।

এদের ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিল। অর্থাৎ ঐ সব বেদুঈন যারা মদীনার চারপাশে বসবাস করত। কুফর কিংবা ঈমান কোন কিছুর প্রতিই তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। তারা ছিল লুণ্ঠনকারী দস্যু। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, মদীনায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের

অন্তরেও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা দানা বেঁধে ওঠে। মুসলিমগণ এভাবে চতুর্দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হন।

২৮.১ বনু কাইনুকা অভিযান

একদিন এক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকার বাজারে দুধ বিক্রি করে কোন প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসেছিল। কয়েকজন ইহুদি সেই মহিলাকে তার মুখের নিকাব খোলার জন্য জোরাজোরি করছিলো, কিন্তু মহিলা তা করতে অস্বীকার করে। এসময় স্বর্ণকার গোপনে মহিলাটির কাপড়ের এক প্রান্ত মাটির সাথে আটকে দিয়েছিল কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারলেন না। তিনি যখন উঠতে গেলেন তখন পেরেকে আটকে তার কাপড় খুলে পড়ল। ভদ্রমহিলাকে এই অবস্থায় দেখে উপস্থিত লোকজন হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করতে থাকল। তখন মহিলাটি আতর্জনাদ করতে থাকলেন এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত এক মুসলিম ইহুদী স্বর্ণকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল। জবাবে ইহুদীরা তার উপর তাকে হত্যা করল। তখন ঐ নিহত মুসলিম ব্যক্তির পরিবার নবীজির কাছে গিয়ে ঘটনার বিচার দিলেন। সবকিছু শুনে রাসূল সাঃ -এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন এবং হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করে পতাকা দিলেন। আবু লুবারাকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর দ্রুতবেগে সেনাবাহিনী নিয়ে বনু কাইনুকার দুর্গের দিকে রওনা দিলেন এবং সেখানে পৌঁছে দুর্গের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেন। রাসূল সাঃ ১৫ দিন পর্যন্ত কঠিনভাবে তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। অবশেষে ইহুদীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের ব্যাপারে রাসূল সাঃ-এর ফয়সালা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করল। রাসূল সাঃ-এর নির্দেশে তাদের সকলকে বেঁধে রাখা হলো। ইহুদিদের এই অবস্থা দেখে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল সাঃ কে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে তাদের ক্ষমা করতে বললেন কিন্তু তিনি কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না।

শেষে রাসূল সাঃ তাদের হত্যা করার পরিবর্তে তিন দিন সময় দিলেন মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং চলে যাওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের গণীমত হিসেবে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে নিলেন। এই অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে।

২৮.২ কথার যুদ্ধ, মিডিয়ায় যুদ্ধ

মদীনার কিছু লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এরা রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর ব্যাপারে আজীবনে কথা বলতো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকেদের খেপিয়ে তুলতো। এরা কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের সরাসরি শত্রু থেকেও ভয়ংকর ছিল।

এদের মধ্যে একজন ছিল কা'ব বিন আশরাফ। সে ছিল বাকপটু এবং ভালো কবি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেইনে সে ছিল সবচেয়ে সরব। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ তৈরীতে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাঃ আরো কিছু সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন। কা'ব বিন আশরাফের শুভাকাজক্ষী ও সাহায্যকারী আবু রাফে' কে আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রাঃ হত্যা করেন।

২৮.৩ বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক ঘটনা

১. গায়ওয়াহ আল কুদর
২. গায়ওয়ায় আস-সাউয়ীক
৩. গায়ওয়াহ যি আমর
৪. সারিয়াহ আল ক্বারদাহ

— এই অভিযানগুলোতে শত্রুরা পালিয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রুর ঘাঁটিতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন। এই অবস্থানকে আধুনিক যুগের 'সামরিক মহড়া'র সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে

মুসলিম সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সতর্ক করে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

২৮.৪ সাহাবীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করেন। যেমন তিনি উমার রাঃ -এর মেয়ে হাফসা রাঃ -এর প্রথম স্বামী মারা যাবার পর তাঁকে বিয়ে করেন। অন্যদিকে রাসূল সাঃ নিজের মেয়ে ফাতিমা রাঃ -এর বিয়ে দেন আলী রাঃ -এর সাথে।

২৯. উহ্দের যুদ্ধ

২৯.১ কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীর পরাজয় ও অপমানের যে গ্লানি এবং তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার যে দুঃখভার বহন করতে হয়েছিল তারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুরাইশগণ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এমনকি তারা তাদের নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ করতেও নিষেধ করে দিয়েছিল এবং বন্দীদের মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেও নিষেধ করেছিল, যাতে মুসলিমরা তাদের দুঃখ যাতনার কাঠিন্য সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে। এ প্রেক্ষিতে কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের জন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণও শুরু করে দেয়।

সময়টি ছিল হিজরি ৩য় বর্ষ ; শাওয়াল মাস। উহ্দ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণে কুরাইশগণ ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। এই বাহিনীর সাথে কিছু নারীকেও তারা যুক্ত করে, যেন নারীদের সামনে সম্মান রক্ষার্থে হলেও প্রাণপণ যুদ্ধ করতে তারা বাধ্য হয়। কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ৩০০০ উট, ২০০ মতান্তরে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ লৌহবর্ম। পুরো বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় আবু

সুফিয়ানকে, ডানদিকের বাহিনীর ও ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি করা হয় খালিদ বিন ওয়ালিদকে এবং বাম দিকের বাহিনীর সেনাপতি করা হয় ইকরামা বিন আবি জাহেলকে। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় হয় প্রায় ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা।

২৯.২ মদীনায় যুদ্ধের সংবাদ ও মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি

কুরাইশ বাহিনী যুদ্ধযাত্রা শুরু করলে মক্কায় থাকা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাঃ মদীনায় যুদ্ধযাত্রার সংবাদ দিয়ে রাসূল সাঃ -কে চিঠি প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি শত্রুসংখ্যা, অস্ত্রের বিবরণ সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। রাসূল সাঃ দ্রুত আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসেন। একপক্ষ মদীনার ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে চাইলেও শেষমেশ মদীনার বাহিরে যুদ্ধ করা নির্ধারিত হয়।

রাসূল সাঃ তাঁর সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেনঃ

১। মুহাজির বাহিনী — এর পতাকা মুসআব ইবনু উমায়ের রাঃ -কে প্রদান করা হয়।

২। আউস গোত্রের বাহিনী — এর পতাকা উসায়েদ ইবনু হুযায়ির রাঃ -কে প্রদান করা হয়।

৩। খায়রাজ গোত্রের বাহিনী — এর পতাকা হুবাব ইবনু মুনযির রাঃ -কে প্রদান করা হয়।

মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। তাদের মাঝে ১০০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং ৫০ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার। মদিনায় লোকদের সালাত পড়ানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। এরপর ১৪ই শাওয়াল, শুক্রবার আসরের সালাতের পর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে। খায়রাজের মিত্র ইহুদীরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে এসেছিল। রাসূল সাঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু আশ-শাওত নামক স্থানে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল।

২৯.৩ উহদের প্রান্তরে

অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর উপর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাঃ -কে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। ইসলামী সৈন্যদের শিবির থেকে পূর্ব-দক্ষিণে একটি ছোট পাহাড়ের ধারে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। শত্রু সৈন্যরা যাতে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য তাঁদের ঐ গিরিপথ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হল। এমন কি তারা যদি দেখে পাখিরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তাঁরা স্থান ত্যাগ না করেন।

দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। মুসলিম বাহিনী নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে মুশরিক বাহিনীকে ধরাশায়ী করতে থাকে। মুশরিকদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে মুশরিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। তীরন্দাজ বাহিনী এতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়ের গিরিপথের উপরে বসে রাসূল সাঃ-এর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুশরিকদেরকে পালাতে দেখে তারা বিজয়ের আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন এবং গনিমত সংগ্রহের জন্য রাসূল সাঃ -এর নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্ধারিত স্থান ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটলেন। আব্দুল্লাহ রাঃ মাত্র নয়জন লোককে নিয়ে ঐ স্থানে বসে রইলেন। এই সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদ সেই পথ দিয়ে তার বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিমদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলেন। কুরাইশদের মূল সেনাদল এ দৃশ্য দেখে সাহস ফিরে পায়। তারা পালানো ফেলে এবার সামনের দিক থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা শুরু করে। সতর্ক হবার আগেই বহু

মুসলিম কুরাইশদের হাতে নিহত হন। বাকীরা পলায়নরত অবস্থায় ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল মুস'আব ইবনু উমায়ের রাঃ এর হাতে। ইবনু কামিয়ার আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে পড়ে গেলে তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন, এরপরের আঘাতে বাম হাত কেটে যায় এবং সাথে সাথে শত্রুর একটি তীর এসে তার বুক ভেদ করে চলে গেলে তিনি শহীদ হয়ে যান। রাসূল সাঃ -এর আকৃতির সাথে মুস'আব রাঃ এর সাদৃশ্য ছিল। তাই তাকে শহীদ করে ইবনু কামিয়া মুশরিকদের দিকে ফিরে গেল এবং ঘোষণা করল যে, মুহাম্মাদ সাঃ কে হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে মুসলিমদের মুসলিমদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয় তা হলো- ইবনু কামিয়ার ঐ কথার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ নিহত হয়েছেন। আর তাঁর নিহত হওয়ার গুজব শুনে সাহাবীদের মনোবল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারা আর যুদ্ধ করার কোন কারণ তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেলেন না। এমন সময় রাসূল সাঃ তাঁদের ফেরানোর জন্য ডাক দিলেন। ফলে মুশরিকরা রাসূল সাঃ -এর অবস্থান জেনে যায় এবং তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। তখন রাসূল সাঃ -এর কাছে মাত্র ৯ জন সাহাবী ছিলেন। মুশরিকরা রাসূল সাঃ -এর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। সাহাবীগণ রাসূল সাঃ -এর ডাক শুনে দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে এলেন এবং তাঁকে পাহাড়ের দিকের ঘাঁটিতে নিয়ে যান। মুশরিকদের একটি দল পাহাড়ের উপর উঠে যায় তাঁদের অনুসরণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূল সাঃ -কে হেফাজতে রাখেন।

আনাস বিন নযর মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ সাঃ নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি? তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয রাঃ এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দ! আমি

উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কুরাইশরা ফিরে যাওয়ার পর মুসলিমরা তাঁদের শহীদ ও আহতদের খোঁজ খবর নেয়ার সুযোগ লাভ করেন। হামজা রাঃ সহ বেশ কিছু সাহাবীদের মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছিল। ৭০ জন সাহাবা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের উহুদ প্রান্তরেই দাফন করা হয়।

৩০. উহুদ থেকে খন্দক

০ সারিয়া ও অভিযানসমূহ

উহুদে মুসলিমদের পরাজয়ে শুধু কুরাইশরা নয়, বরং কিছু আরব মুশরিক গোত্রও বেশ খুশি হয়। তারা অনেকেই মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর কিছু তাৎক্ষণিক সামরিক পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করা সম্ভব হয়। তাই উহুদ পরবর্তী বেশ কয়েক মাস অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় মুসলিমদের ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়া ও অভিযানসমূহ—

১. আবু সালামার অভিযান
২. আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাঃ -এর অভিযান
৩. রায়ী'র ঘটনা
৪. বীরে মাউনার হত্যাকাণ্ড
৫. বনু নাযির যুদ্ধ
৬. যাতুর রিক্বা যুদ্ধ
৭. ২য় বদর যুদ্ধ

০ রাযী'র ঘটনা

আল্লাহর রাসূল সাঃ রাযী নামক স্থানে আসিম ইবনে সাবিত আল আক্বলাহ রাঃ -এর নেতৃত্বে সাহাবীদের নয়জনের একটি ছোট্ট দল প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদের পাঠিয়েছিলেন 'কাররাহ' এবং 'আদুল' এই দুই গোত্রের অনুরোধে। তারা রাসূল সাঃ -এর কাছে এসে বলেছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। হুকুম আহকাম শেখার জন্য সাহাবীদের তাদের কাছে পাঠাতে।

সাহাবাগণ যখন উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি বনু লাহয়ান গোত্রের ভূমিতে যখন পৌঁছলো, তখন প্রায় ১০০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। আসিম ইবনে সাবিত বুঝতে পারলেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। জান বাঁচানোর জন্য একটি ছোট পাহাড়ে তারা পালিয়ে গেলেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে তাদের বলা হলো, 'যদি তোমরা আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।' আসিম বুঝতে পারলেন তারা মিথ্যা বলছে। তিনি তাদের কথায় টললেন না, বললেন, 'মুশরিকদের অঙ্গীকারে আমি বিশ্বাস করি না।' আসিম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। একে একে ৭ জন সাহাবী শাহাদতবরণ করেন। জীবিত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খুবাইব রাঃ, যায়দ বিন দাসিন্নাহ রাঃ এবং আবদুল্লাহ বিন তারিক রাঃ। আবারও বনু লাহয়ান তাদের ওয়াদা পুনর্ব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন। কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাঁদের বেঁধে ফেলে। আবদুল্লাহ বিন তারিক রাঃ বুঝতে পারেন যে তাঁদের ধোকা দেয়া হয়েছে। তিনি কোনোভাবে দড়ির মধ্যে থেকে হাত বের করে তলোয়ার হাতে নিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা ছিল নাগালের বাইরে। শত্রুরা এরপর পাথর ছুড়ে তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব রাঃ এবং যায়দ বিন দাসিন্নাহকে রাঃ মক্কায়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

খুবাইব রাঃ কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'দু' রাকআত সালাত পড়ার জন্য সময় ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন,

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।'

এরপর খুবাইব রাঃ -কে আবু সুফিয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদ সাঃ -কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজনসহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটাই তো সহনীয় নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ সাঃ -কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাঁটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'

এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু 'আমির বিন উমাইয়া যামরী রাঃ তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব রাঃ -কে হত্যা করেছিল উক্বাহ বিন হারিস। খুবাইব রাঃ তার পিতা হারিসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়দ বিন দাসিন্নাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরাইশগণ আসিম রাঃ -এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে শনাক্ত করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমরুলের বাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দূরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। আসিম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। উমার যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, *‘আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।’*

০ বীরে মাউনার হত্যাকাণ্ড

যে মাসে রাযীর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বীরে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযী'র ঘটনার চাইতেও কঠিন ও বেদনাদায়ক।

এ ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আবু বারা' 'আমির বিন মালিক যিনি 'মুলায়েবুল আসিন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী কারীম সাঃ -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম সাঃ তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে রাঃ নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।'

রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, ‘নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি।’

আবু বারা’ বললেন, ‘তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।’

অতঃপর রাসূল সাঃ মুনযির বিন আমির রাঃ -এর নেতৃত্বে ৭০ জন সাহাবী প্রেরণ করলেন। সাহাবাবুন্দ রাঃ ছিলেন বিজ্ঞ, ক্লারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দন্ডায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ কূপটি বনু ‘আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ রাঃ উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পত্রসহ আল্লাহর শত্রু ‘আমির বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, ‘আল্লাহ মহান! কাবার প্রভুর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।’

এরপর পরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের রাঃ আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহবান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবু বারা’র আশ্রয়ে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহবানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সুলাইমকে আহবান জানাল। বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র এ আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ রাঃ -কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। কেবলমাত্র কা’ব বিন যায়দ রাঃ জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

আরও দু'জন সাহাবী- 'আমর বিন উমাইয়া যামরী রাঃ এবং মুনযির বিন উক্ববা বিন আমির রাঃ উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর মুনযির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করেন। 'আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয় যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে- যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল- তাঁকে মুক্ত করে দেয়।

আমর বিন উমাইয়া যামরী রাঃ এ বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছিলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদাত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩১. খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে। বনু নাযির গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর তারা খাইবারে আশ্রয় নিলো। এরপর পরিকল্পনা করলো একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গঠন করার। তাদের নেতারা মক্কায সফর করে কুরাইশ, গাতফান ও তাদের আরও কিছু মিত্রশক্তি একটি সম্মিলিত সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সম্মিলিত জোটে সৈন্য ছিল দশ হাজার, যার ছয় হাজারই সরবরাহ করে বনু গাতফান ও তাদের মিত্রশক্তি। আর বাকি চার হাজার সৈন্য সরবরাহ করে কুরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তি। ইহুদিদের নিজস্ব তেমন কোনো লোকবল ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ

প্রস্তুতি সহ তারা মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। সংবাদ পেয়ে রাসূল সাঃ সালমান ফারসী রাঃ -এর পরামর্শে মদিনার চারপাশে খন্দক তথা পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিখা খনন শেষে মদীনার নারী ও শিশুদেরকে দুর্গ এবং গোত্রসমূহের সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমীর বানানো হল আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ -কে। রাসূল সাঃ ৩০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং সালআ পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিল খন্দক যা মুসলিম বাহিনী ও কাফির বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছিল। এই যুদ্ধে মুসলিমদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল- "হা মীম। লা ইউনসরুন" (হা মীম। তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)।

মুশরিকগণ মদীনার কাছে এসে পরিখা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা এরকম কিছু আশাই করেনি! তারা ভেবেছিল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে খুব সহজে মদীনা দখল করে ফেলবে। তাদের মনোবলে কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। কেননা তারা এসেছিল সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিয়ে। মদীনাকে অবরোধ করে রাখা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। খন্দকের যুদ্ধে বদর বা উহুদের মতো মুখোমুখি যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ হয়। জোট বাহিনী বিভিন্নভাবে মদীনায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু তারা বিফল হয়। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফিকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল।

১ মাস তারা মুসলিমদের অবরোধ করে রাখে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উপর ঝড়ো বাতাস প্রেরণ করলেন। বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে তাদের মনে হচ্ছিলো যেন তারা মারাই যাবে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত মনোবল বা সাহস কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল।

৩২. বনু কুরাইযার অভিযান

খন্দক যুদ্ধ থেকে ফেরার পরপরই বনু কুরাইযাকে শায়েস্তা করার নির্দেশ আসে। রাসূল সাঃ সাহাবাদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েন এবং বনু কুরাইযাকে অবরোধ করেন। প্রায় ২৫ দিন অবরোধে রাখার পর বনু কুরাইযা আত্মসমর্পণ করে। তাদের শর্ত ছিল আউস গোত্রের সা'দ বিন মুয়াজ যেনো তাদের বিচারক হন। তাদের আশা ছিল সা'দ তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। কারণ আউস গোত্রের সাথে বনু কুরাইযার মিত্রতা ছিল। কিন্তু সা'দ বিন মুয়াজ রাঃ রায় দিলেন যে, বনু কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় রায় বেরিয়ে এল তাঁর পছন্দের এক বান্দার মুখ থেকে।

৩৩. খন্দক থেকে হুদাইবিয়া

খন্দকের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক টার্নিং পয়েন্ট। এ যুদ্ধের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের লড়াই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এ যুদ্ধের পর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবার টিকে থাকার সংগ্রামকে ছাড়িয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজ ধারণ করে। আরবের রাজনৈতিক শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযান পরিচালনা করার সাহস হারিয়ে ফেলে।

রাসূল সাঃ যখন খন্দক এবং বনু কুরাইযার অভিযান এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ করলেন তখন শান্তি বিঘ্নকারী গোত্র এবং বেদুইনদের বিরুদ্ধে সংশোধনী আক্রমণ পরিচালনা শুরু করলেন—

১. সালাম বিন আবিল হুকাইকের হত্যা
২. মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাঃ -এর অভিযান
৩. বনু লাহইয়ান যুদ্ধ

৪. গামরের অভিযান
৫. যুল ক্বাসসাহর অভিযান
৬. জামুম অভিযান
৭. ঈস অভিযান
৮. ত্বারিফ অভিযান
৯. ওয়াদিল কুরা অভিযান
১০. খাবাত্ত অভিযান
১১. বনু মুসত্বালাক্ক যুদ্ধ

৩৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সাঃ স্বপ্নে দেখেন, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছেন, তিনি আরো দেখেন যে, তিনি কা'বা গৃহের চাবি গ্রহণ করে সাহাবীগণসহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ এবং উমরাহ পালন করছেন। এ প্রেক্ষিতে রাসূল সাঃ চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাসূল সাঃ কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায়ে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে রাসূল সাঃ -কে জানালেন যে কুরাইশরা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। যেকোনো মূল্যে তারা রাসূল সাঃ -এর মক্কায়ে প্রবেশ ঠেকাবে। রাসূল সাঃ সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর রাঃ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাবাঘর তাওয়াফে এসেছেন, কারো সাথে যুদ্ধ করতে নয়। আপনি আপনার লক্ষ্যে অটল থাকুন। যারা এই লক্ষ্যে বাধা দেবে, আমরা কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।”

রাসূল সাঃ আবু বকর রাঃ -এর মত পছন্দ করলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলে। কুরাইশরা খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরামা বিন আবু জাহেলের নেতৃত্বে ২০০ সৈন্যের

বাহিনী পাঠালো। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ বিকল্প পথে অগ্রসর হলেন। মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে রাসূল সাঃ দূত হিসেবে উসমান রাঃ কে পাঠালেন এটা জানানোর জন্য যে, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি। উমরাহ পালন করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কুরাইশরাও দূত প্রেরণ করতে লাগলো। তারা উসমান রাঃ -এর মাধ্যমে রাসূল সাঃ -এর নিকট একটি উপযুক্ত জবাব পাঠাতে চেয়েছিলো। উসমান রাঃ -এর প্রত্যাবর্তনকে বিলম্বিত করতে চেয়েছিলো যেন ওই সময়ের মধ্যে তারা একটি সুস্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে। কিন্তু উসমান রাঃ -এর প্রত্যাবর্তনে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, তখন ঘোষণা দিলেন যে, ‘যুদ্ধের মাধ্যমে যতক্ষণ একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এ জায়গা পরিত্যাগ করব না।’ অতঃপর রাসূল সাঃ সাহাবীগণকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রাসূল সাঃ -এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদিনায় ফেরত যাবেন না। বায়আত পর্ব শেষ হওয়ার পরেই উসমান রাঃ মক্কা হতে ফেরত আসলেন এবং তিনি নিজেও অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। কুরাইশগণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করল এবং সোহাইল বিন ‘আমরকে সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর দরবারে প্রেরণ করল। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি রচিত হলো। ইসলামের ইতিহাসে এটি ‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’ নামে পরিচিত।

৩৫. হুদায়বিয়া থেকে খাইবার

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে ‘আমর বিন আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং উসমান বিন ত্বালহাহ রাঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরা যখন মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলেন তখন নাবী কারীম সাঃ বললেন, ‘মক্কা তার কলিজার টুকরোদের আমাদের নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে’

৩৬. খাইবারের যুদ্ধ

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিশ দিনের মাথায় আল্লাহর রাসূল সাঃ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। গোটা আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল খাইবারে। মুসলিমরা জানতেন খাইবারে তাদের বিজয় হবেই। কারণ কয়েকদিন আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাইবারে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

"...তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে..." (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমাহার। এই দুর্গগুলো খাইবারের বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ কারণে খাইবার যুদ্ধ ইহুদিদের সাথে আগের সব যুদ্ধগুলোর তুলনায় বেশ জটিল ছিল। অবস্থানগত দিক থেকেও খাইবার ছিল সুরক্ষিত একটি এলাকা। রাসূলুল্লাহ সাঃ এক এক করে সবগুলো দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরু হলো নাসিম দুর্গ দিয়ে।

দশ দিনের মাথায় আলী রাঃ -এর নেতৃত্বে নাজিম দুর্গ জয় হয়ে গেল। এরপর মুসলিমরা অগ্রসর হলেন আস-সা'ব দুর্গের দিকে। তিন দিনের মাথায় আস-সা'ব দুর্গ জয় হলো। এরপর তারা অগ্রসর হলেন আয-যুবাইর দুর্গের দিকে। সেখানে তাদের অবরোধ করে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার তিন দিনের মাথায় তারা যুদ্ধ করতে নেমে আসলো এবং পরাজিত হলো। তারপর মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযান চালালো উবাই দুর্গে। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খুব সহজে উবাই দুর্গ আয়ত্তে চলে আসলো। এরপর মুসলিমরা একে একে জয় করলেন আল-কামূস, আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালাম দুর্গ। চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই দুর্গের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। এভাবেই বিজয় হলো সমগ্র খাইবার। এরপর ইহুদিরা অস্ত্র ছেড়ে সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে। এ যুদ্ধে নিহত হয় তিরানব্বই জন ইহুদি। আর মুসলিমদের থেকে শহীদ হন পনেরো থেকে বিশ জন, আল্লাহই ভালো জানেন।

খাইবারের ইহুদিরা রাসূলুল্লাহর কাছে অনুরোধ করলো যেন তাদেরকে খাইবারে থাকতে দেওয়া হয়। তারা বললো, 'আমরা আপনাদের চাইতে এই ভূমি চাষাবাদে বেশি দক্ষ।' এই কথা বলে আসলে তারা খাইবারে তাদের থাকতে দেওয়ার জন্য নবীজি সাঃ -কে মানানোর চেষ্টা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক ইহুদিরা পাবে-- এই শর্তে ইহুদিরা খাইবারে থেকে যাওয়ার অনুমতি পেল। তবে রাসূলুল্লাহ সাঃ শর্ত আরোপ করে দিলেন— মুসলিমরা যখন চাইবে, তখনই তাদেরকে খাইবার থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার রাখে। খাইবার বিজয়ের মাধ্যমে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা বেশ সচল হয়। কারণ খাইবার থেকে মুসলিমরা বিপুল পরিমাণ গণিমত অর্জন করে।

খাইবারের সাথে আরও দুটি অঞ্চল বিজয় হয়। সেগুলো হলো ওয়াদী আল-কুরা এবং তাইমা। ওয়াদী আল-কুরার ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের সাথে খাইবারের অনুরূপ চুক্তি করা হয়। আর তাইমার অধিবাসীরা ফাদাকের মতো যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে।

৩৭. কাযা উমরা

হুদাইবিয়ার সন্ধির এক বছর পর আল্লাহর রাসূল সাঃ উমরার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন। তিনি বলে দিলেন আগের বছর যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে ছিলেন তারা কেউ যেনো বাদ না পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শহীদ হয়ে গেছেন। নতুন অনেকে যুক্ত হলেন। নারী ও শিশু ছাড়াই উমরা যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ২ হাজার। রাসূলে কারীম সাঃ আবু রুহম গিফারী রাঃ -কে মদীনায় তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। যুল হুলাইফাতে উমরাহর জন্য তাঁরা ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়িক ধ্বনি উঁচু করলেন। নাবী কারীম সাঃ -এর সঙ্গে মুসলিমরাও লাব্বায়িক পড়লেন। মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কায় কাফেলার লোকজনদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ ভারী অস্ত্রশস্ত্র মক্কার সীমানার ঠিক বাইরে রেখে গেলেন যেন হঠাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। তিনি এগুলো সাথে রেখেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য নয়। এগুলোর দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার উপরে। তাঁর সাথে ছিল দুশো ঘোড়সওয়ারি। তারা মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের সাথে তার শান্তিচুক্তি ছিল সত্যি কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকারের উপর শতভাগ আস্থা রাখেননি, কারণ ইসলামের শত্রুদের কখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। মক্কার লোকেরা অনেকেই আগ্রহভরে মুসলিমদের দেখছিল। কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ে। মক্কার মুশরিকরা গুজব ছড়ালো মদীনার মুসলিমরা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাদের এই গুজবের জবাব দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবীদের আদেশ করলেন যেন তারা নিজেদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে দিয়ে জোরে জোরে তাওয়াফ করেন। তিনি চাইছিলেন কুফ্যাররা মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতার বিন্দুমাত্র ছাপও যেন খুঁজে না পায়। আর হয়েছিলও তাই, কুফ্যাররা মুসলিমদের এভাবে তাওয়াফ করতে দেখে বলে, 'ওদেরকে দেখে তো মোটেও দুর্বল মনে হচ্ছে না...'

আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে নাবী কারীম সাঃ সাফা' ও মারওয়ার সা'ঈ করলেন। ঐ সময়ে নাবী কারীম সাঃ -এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সা'ঈ শেষে বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটে পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুন্ডন করলেন। সাহাবাগণও অনুরূপ করলেন। এরপর কিছু সাহাবীকে মক্কার বাহিরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুলোকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যারা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা উমরাহ পালন করবেন। উল্লেখিত উমরাহকে 'উমরায়ে ক্বাযা' এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তা উমরায়ে হৃদায়বিয়াহর ক্বাযা হিসেবেই আদায় করা হয়েছিল।

উল্লেখিত উমরাহ পালন কালে নাবী কারীম সাঃ মায়মুনা বিনতে হারিস আমেরিয়া রাঃ -কে বিবাহ করেন।

৩৮. মু'তাহর যুদ্ধ

মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল উলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান। মদীনাকে ইহুদীমুক্ত করার পর এবং হৃদায়বিয়াতে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতাহ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা উমার রাঃ -এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়।

আশ-শামে রোমানদের ভূমি আক্রমণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ ৩০০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণত কোনো অভিযান পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল একজন আমীর নিযুক্ত সাধারণত কোনো অভিযান পাঠানোর সময়

আল্লাহর রাসূল সাঃ একজন আমীর নিযুক্ত করে দিতেন। কিন্তু এবারে তিনি ক্রমানুসারে তিনজন সাহাবীকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। বললেন, 'আমীর হচ্ছে যায়িদ ইবন হারিসা। যদি সে শহীদ হয়, তাহলে জাফর ইবন আবি তালিব। আর যদি সেও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা।"

যায়িদ বিন হারিসার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী শামে পৌঁছানোর পর আবিষ্কার করলেন, তাঁদের সামনে ২ লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী। তাঁরা দুইদিন ধরে শূরা করলেন এবং যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী মুতাহ নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপতি শহীদ হলে সকলের পরামর্শে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ সেনাপতি হন। রাত নেমে এলে যুদ্ধে বিরতি হলো। খালিদ বিন ওয়ালিদ ভাবছেন কীভাবে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি তারা দ্রুত পিছু হটেন, তাহলে শত্রুরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারে। তিনি এমন একটা কৌশল বের করলেন যাতে মুসলিমরা পশ্চাদপসরণ করবে ধীরে ধীরে কিন্তু শত্রুরা মুসলিমদের ধরতে পারবে না। রাতের অন্ধকারে তিনি ডান পাশের সৈনিকদের বাম পাশে, আর বাম পাশের সৈনিকদের ডান পাশে স্থানান্তর করলেন। সামনের সৈনিকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন পেছনে, পতাকাগুলোর অবস্থানও বদলে দিলে। খালিদের এই কৌশল চমৎকারভাবে কাজ করলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর নতুন চেহারা দেখে ভাবলো নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনীতে অতিরিক্ত সৈন্য যোগ হয়েছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, মুসলিমরা যদি মাত্র তিন হাজার সৈন্য আগের দিন ময়দানে টিকে থাকতে পারে, তাহলে নতুন সৈন্য নিয়ে না জানি তারা কী করবে! এই ভয়ে রোমানরা বেশ মুষড়ে পড়লো এবং পিছিয়ে গেল। খালিদ ঠিক এটাই চাচ্ছিলেন। এই সুযোগে তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মদীনায় নিরাপদে ফিরে এলেন। পুরো মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হতে পারতো, কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের অসাধারণ কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলা সেই বাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। দুই লক্ষ সৈনিকের মোকাবেলায় এই যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র দশ জন শহীদ হন।

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের নিপতিত করা হয়েছিল সে প্রতিশোধ গ্রহণ যদিও সম্ভব হয় নি, তবুও মুসলিমগণের জন্য তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলিমগণ যে একটি অকুতোভয় জাতি এবং কোন পার্থিব শক্তি তা যত বিশালই হোক না কেন তার কাছে যে তাঁরা মাথা নোয়াতে পারেন না, তা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণের শৌর্যবীর্যের কথাও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল এবং এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র আরব জাহান স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে পড়ল। শত্রুভাবাপন্ন আরব জাহান মনে করে ছিল রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি হবে মুসলিমগণের জন্য আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু মাত্র তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ দুই লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার।

৩৯. মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়া ছিল দশ বছরের জন্য, কিন্তু এক বছরের কিছু বেশি সময় যেতেই কাফিররা চুক্তিভঙ্গ করে। এই ঘটনার পর আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো কুরাইশরা খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। সে বুঝতে পারছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এই চুক্তিভঙ্গের বিষয়টা এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না। তড়িঘড়ি করে সে মদীনা গিয়ে রাসূল সাঃ -কে অনুরোধ জানালো সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য। রাসূল সাঃ তাকে গ্রাহ্য করলেন না। এরপর সে একে একে আবু বকর, উমার এবং আলী রাঃ -এর নিকটেও গেলো। কিন্তু তাঁরা তাকে দায়সারা কথা বলে বিদায় করে দিলেন।

৮ম হিজরীর ৭ই রমযান, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাঃ মদীনা হতে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রমযান এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মক্কার চারদিকে মুসলিমদের চারটি বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নিলো যে, প্রতিরোধ গড়ার মতো কোনো অবস্থাই কুরাইশদের ছিল না। তারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিল।

বিনা বাধায় মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে লাগলো। শুধুমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ যদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন সেদিকে বনু বকর এবং হুদাইল বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ তাদের পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দেন। অল্পসময়েই তারা কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে। এটাই ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে একমাত্র নামে মাত্র প্রতিরোধ। মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহ্ম কুলছুম বিন হোসায়েন আল-গেফারী।

রাসূল সাঃ ডান ও বাম পাশে মোতায়েন আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মাসজিদুল হারামে আগমন করলেন। মাসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বাগ্রে তিনি হাজার আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তার পর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর হাতে একটি ধনুক ছিল এবং আল্লাহর ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপর ৩৬০টি মূর্তি ছিল। নাবী কারীম সাঃ সে ধনুক দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে করতে বলেছিলেন,

‘হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।’ (আল-ইসরা (১৭) : ১৮]

‘বল- সত্য এসে গেছে, আর মিথ্যের নতুন করে আবির্ভাবও ঘটবে না, আর তার পুনরাবৃত্তিও হবে না।’ [সাবা (৩৪) : ৪৯]

তিনি নিজের উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং ইহরাম অবস্থায় না থাকার কারণে শুধু তাওয়াফ করাই যথেষ্ট মনে করেন। তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর উসমান বিন ত্বালহাহ রাঃ -কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা’বা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন। এরপর নাবী কারীম সাঃ ভিতর থেকে কা’বা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল রাঃ ভিতরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান। নাবী কারীম সাঃ সেখানেই সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশগুলো তিনি

ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাকবীর ও একত্ববাদের আয়াতগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর কা'বা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কাবা ঘরের সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিল। দরজার দু' অংশ ধারণ করে নিম্নভাগে দন্ডায়মান কুরাইশদের সম্বোধন করে নাবী কারীম সাঃ বললেন,

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি একক ভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানো সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান, অথবা পূর্ণতা, অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দুই পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোণিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম আঃ -এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি।’

এরপর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন,

‘হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি এবং সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জ্ঞাত আছেন এবং সব খবর রাখেন। [আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৩]

রাসূল সাঃ উসমান বিন তালহাহ এর নিকট কাবাঘরের চাবি অর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন মক্কা বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করলেন এবং এটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে মক্কাই ছিল নাবী কারীম সাঃ -এর আবাসস্থল এবং জন্মভূমি ও মাতৃভূমি, এ প্রসঙ্গে

আনসারগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকলেন যে, নিজ শহর ও জন্মভূমি বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ কি মক্কাতেই অবস্থান করতে থাকবেন? ঐ সময় তিনি হাত দু'টো উত্তোলন করে সাফা পাহাড়ের উপর প্রার্থনারত ছিলেন। প্রার্থনা শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী কথা বলেছ?' তারা বললেন, 'তেমন কিছু নয় হে আল্লাহর রাসূল সাঃ।' কিন্তু আল্লাহর নাবী সাঃ বিষয়টি জানাবার ব্যাপারে মত পরিবর্তন না করায় তাঁরা তাঁদের আলোচনার বিষয়টি তাঁর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বললেন, “আল্লাহর আশ্রয়, এখন জীবন এবং মরণ তোমাদের সঙ্গেই হবে।”

রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় তৎপর থাকেন এবং মানুষকে হিদায়াত ও তাকওয়ার আদেশ দিতে থাকেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই নাবী কারীম সাঃ -এর নির্দেশক্রমে আবু উসাইদ রাঃ খুযা'য়ী নতুন ভাবে হারামের সীমানার স্তম্ভ খাড়া করেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও মক্কার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়।

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল সাঃ তাদের কারো প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাজার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা দশ হাজার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল মক্কার উপরে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা। টু শব্দটি করার সাহস কারো হল না। নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী। কা'বাগৃহ হল মূর্তিশূন্য। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস।

৪০. হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেয়ে বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াযিন আন্দাজ করছিল যে, এরপর রাসূল সাঃ তায়েফ অভিমুখে জোরদার বিজয়ী অভিযান চালাবেন। কারণ, ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় সেটাই হত সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। তাই মুসলিমদের আগেই তারা নিজেরাই মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। তারা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে অপমানজনক মনে করছিল। এই কারনেই মালিক বিন আউফ নাসরীর নেতৃত্বে প্রায় ২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত হয়ে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল দিবস রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কা হতে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল মক্কা আগমনের উনিশতম দিবস। নাবী কারীম সাঃ -এর সঙ্গে ছিল বার হাজার সৈন্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন দশ হাজার সৈন্য এবং মক্কার নও মুসলিমগণের মধ্য হতে সংগ্রহ করেছিলেন আরও দু' হাজার সৈন্য।

১০ই শাওয়াল মধ্য রাত্রি মুসলিম বাহিনী হুনাইনে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মালিক বিন আউফ পূর্বেই তার বাহিনী নিয়ে সেখানে অবতরণ করে এবং রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত সজোপনে তারা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে দেয়। সাহরীর সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করে নিলেন এবং পতাকা বেঁধে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করলেন। অতঃপর সকালে মুসলিম বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে হুনাইন উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা জানতেন না যে, শত্রুপক্ষের সাক্কীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের বীর সৈনিকগণ এ উপত্যকায় সংকীর্ণ গিরিপথে অবস্থান গ্রহণ করেছে। এ কারণে সম্পূর্ণ নিরুদ্ভিন্ন চিত্তেই তাঁরা সেখানে অবতরণ করছিলেন। এমন সময় আকস্মিকভাবে তাঁদের তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু দলে দলে তাঁদের উপর এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকস্মিক এ আক্রমণের প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এমনভাবে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকল যে কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করল না।

রাসূলুল্লাহ সাঃ চিৎকার করে সাহাবীদের ডাকলেন, “হে লোকেরা, আমার দিকে এসো”। তিনি আপন চাচা আব্বাস রাঃ -কে নির্দেশ প্রদান করলেন সাহাবীগণ রাঃ -কে উচ্চস্বরে আহ্বান জানাতে। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র মুসলিম সৈন্যগণ যে গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ঠিক সে গতিতেই পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতে থাকলেন। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে কালো ধোঁয়ার স্রোতের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূল সাঃ জমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করে দিয়ে বললেন, ‘শাহাতিল উজুহ’ ‘মুখমন্ডল বিকৃত হোক’। এ এক মুষ্টি মাটি এমনভাবে বিস্তার লাভ করল যে, শত্রুপক্ষের এমন কোন লোক ছিল না যার চক্ষু এ মাটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর মাটি নিক্ষেপের কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয়ে গেল এবং আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে না হতেই তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। সাক্ষীফের সত্তর জন লোক নিহত হল এবং তাদের সঙ্গে যা কিছু সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, মহিলা, শিশু এবং গবাদি ছিল সবই মুসলিমগণের হস্তগত হল।

৪১. তাবুক যুদ্ধ

৪১.১ প্রেক্ষাপট

আরব গোত্রগুলির উপর মুসলিমদের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার কারণে রোমান সম্রাট চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি আরব ভূখন্ডের সীমান্তবর্তী সাম্রাজ্যের জন্য তারা মুসলিমদেরকে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তাই মুসলিমদের আক্রমণের পূর্বেই ইসলামী শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য রোমান সম্রাট এক চূড়ান্ত ফয়সালা কারীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো।

এদিকে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে ৪০ হাজার সৈন্যের একটা বিরাট দল মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি— এ খবর মদীনায়ে আসার পর মুসলিমদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মদিনার মুনাফিকরা এমনভাবে এই

ঘটনাটিকে উপস্থাপন করা শুরু করে যা মুসলিমদের মধ্যে চিন্তা চেতনা বাড়িয়ে তোলে। এদিকে খবর আসতে থাকে নিজ পতাকার আওতায় খ্রিস্টান গোত্র সমূহের মধ্যে লাখো জুজান ও অন্যান্য গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে তাদের বাহিনী গঠন করতে শুরু করে।

৪১.২ মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নেতৃত্বে মুসলিমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম এবং তখন বাগবাগিচায় ফলমূল সংগ্রহ করার সময় এই সময়টা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পছন্দনীয় সময় ছিল না, তারপরেও রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নির্দেশে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেন এবং মক্কার বিভিন্ন গোত্র ও অধিবাসীগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য। প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অভাব অনটনের কারণে মানুষের যুদ্ধে যেতে অনীহা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সূরা তাওবার একটা অংশ অবতীর্ণ করেন। তার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দান সদকা করার ফজিলত বর্ণনা করা হয় এবং আল্লাহর পথে আপন আপন উত্তম সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্র ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মদীনায় জড়ো হতে থাকে। যাদের অন্তরে মুনাফিকতা ছিল তারা বাদে সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিছু গরীব ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর খিদমতে হাজির হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু সওয়ারি না থাকার কারণে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

৪১.৩ যুদ্ধের ময়দানে

প্রায় ৩০ হাজার সেনা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ তাবুকের পথে রওনা হন। ইতিপূর্বে এত বিশাল বাহিনী মুসলিমদের কখনোই ছিল না। এ বিশাল বাহিনীর খাদ্য ও যানবাহনের

সমস্যা ছিল। ১৮ জনের প্রতি দলের জন্য একটি মাত্র উট বরাদ্দ করা হয়েছিল। অনেক সময় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। পথিমধ্যে তীব্র পানির সংকট দেখা দিল লোকজন রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট তা জানালে তিনি পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করলেন এবং বৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিন সৈন্যরা তাবুক অবতরণ করে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাঃ সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করেন আল্লাহর শান্তির ভয় প্রদর্শন এবং তার রহমতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। এই ভাষণের ফলে সৈন্যদলের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাবুক গোত্র সমূহের মধ্যে বিশাল ভয় ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে কারন তাদের ধারণা ছিল না এতটা পথ পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী তাবুক আক্রমণ করতে পারে। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সুবাদে মুসলিম বাহিনী সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যা হয়তো যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা মোটে সহজ কাজ ছিল না। সে সময়ে রাসূল সাঃ শাম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি শহর দখল করে তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন ও জিযিয়া গ্রহণ করেন।

৪১.৪ মদীনায় প্রত্যাবর্তন

সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। তবে পথের মধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথের নিকট ১২ জন মুনাফিক নাবী কারীম সাঃ -কে হত্যার এক ঘণ্টা প্রচেষ্টা চালায়। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুধু আন্নার রাঃ এবং হুযায়ফা রাঃ। অন্যান্য সাহাবীগণ রাঃ দূরবর্তী উপত্যকার নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। মুনাফিকদের আক্রমণের সময় হুযায়ফা রাঃ তাঁর ঢালের সাহায্যে মুনাফিকদের বাহনগুলোর মুখের

উপর প্রবল ভাবে আঘাত করতে থাকলেন। এর ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করতে করতে গিয়ে লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল।

সফর শেষে নাবী কারীম সাঃ যখন দূর হতে মদীনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, (তাবা) এবং (উহুদ), এগুলো হচ্ছে সেই পর্বত যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি। এদিকে যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আগমন সংবাদ পৌঁছে গেল তখন মহিলা ও কিশোরেরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। উক্ত যুদ্ধে যে সকল লোক অনুপস্থিত ছিল যারা ছিল অপারগ অথবা মুনাফিক। তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা প্রকৃত মুমিন ছিলেন এবং কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। আল্লাহ। আল্লাহ তাঁদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন। প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাঃ মদীনায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে অবস্থান করেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর লোকজনদের জন্য সেখানে বসে পড়েন। এ সময় আশি জনেরও অধিক মুনাফিকের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে নানা ওয়র আপত্তি দেখায় এবং শপথ করতে থাকে। নাবী সাঃ বাহ্যিকভাবে তাদের ওয়র গ্রহণ করে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন এবং ক্ষমা প্রদান করেন। অতঃপর প্রশ্টি আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাঃ রজব মাসে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রত্যর্তন করেছিলেন রমযান মাসে। এ সফরে পূর্ণ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। তাবুকে অভিযান ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযান যাতে স্বশরীরে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

৪২. বিদায় হজ্জ

রাসূলুল্লাহ সাঃ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হজ্জেই রাসূলুল্লাহ সাঃ মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে দেখার ও শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।

অতঃপর যূল ক্বাদাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি যুহর সালাতের পর রওনা হয়ে আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু’ রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন করে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। পরদিন যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম সাঃ ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা রাঃ রাসূল সাঃ -এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী সাঃ -এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু’ রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে ‘লাব্বায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে ‘ক্বাসওয়া’ নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার ‘লাব্বায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ করে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচ্চ কণ্ঠে ‘লাব্বায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন মক্কার নিকটবর্তী যী'তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছিলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান। মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম সাঃ মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম সাঃ -এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী সাঃ -এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

“ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোণিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম

রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমায়ান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভুর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।”

রাসূল সাঃ সমবেত সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন,

‘আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?’

সাহাবীগণ বললেন, ‘আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর

অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ক আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ রাঃ -এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাঃ শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

“হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক।”

নাবী কারীম সাঃ -এর বাণীসমূহকে রাবী’আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন। রাসূলে কারীম সাঃ যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।” (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল সাঃ আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, ‘যখন কোনো কিছু উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।’ উমার বলতে চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে।

নাবী কারীম সাঃ -এর ভাষণের পর বিলাল রাঃ প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল রাঃ অব্যাহত ইকামত করলেন। এ দু’ সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ সাঃ অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্লাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তূপ) সামনে করলেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে

নাবী কারীম সাঃ একই অবস্থায় অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মন্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ সাঃ উসামা রাঃ -কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী কারীম সাঃ ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস রাঃ -কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। নাবী কারীম সাঃ জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম সাঃ বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম সাঃ কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নির্দেশক্রমে আলী রাঃ ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ আলী রাঃ -কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম সাঃ -এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ এবং আলী রাঃ এ গোশত খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল।'

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ সাঃ এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী রাঃ তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ রাঃ -কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। অদ্যকার ভাষণে নবী কারীম সাঃ গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

'আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা'দাহ, মূল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।' অতঃপর নবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন মাস? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাঃ ভাল জানেন।' এ প্রেক্ষিতে নবী কারীম সাঃ নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?' আমরা বললাম, 'তা কেন হবে না'? এর পর নবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'এ শহরটি কোন শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং

তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' নবী কারীম (সাঃ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ শহর কি মক্কা নয়'? আমরা বললাম তা কেন হবে না? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নবী কারীম (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন দিবস'? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন'। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়'? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়'? আমরা বললাম অবশ্যই'। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বলো আমি কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, অতঃপর নবী কারীম সাঃ বললেন, 'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক' যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম সাঃ এ কথাও বলেছিলেন, স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না।

কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ ১১, ১২, ও ১৩ যুল হিজ্জাহ মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহবানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী কারীম সাঃ আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সারায়্যা বিনতে নাবহান রাঃ বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয় কি? নাবী কারীম সাঃ -এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাজিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, ১৩ই যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম সাঃ মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বিদা’ আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জের নিয়মাবলী হতে ফারোগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাঃ আপন সওয়ারীকে মদীনা অভিমুখী করলেন।

৪৩. সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান

যখন আল্লাহর দীন ও ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করল এবং আরবের সমগ্র নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের আয়ত্তে এসে গেল তখন রাসূলের আবেগ-অনুভূতি, কথাবার্তা ও আচার আচরণে ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগলো যে, অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদের বিদায়-

সম্ভাষণ জানানোর প্রস্তুতি রাসূল সাঃ নিতে শুরু করেছেন। তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

সাধারণভাবে রমজান মাসের শেষ দশ দিন তিনি ইতেকাফ করতেন। কিন্তু দশম হিজরীর রমযান মাসে তিনি বিশদিন ইতেকাফ করলেন। এছাড়াও এবছর জিবরাইল আঃ রাসূলকে দুইবার কুরআন পাঠ করে শুনালেন। যেখানে অন্যান্য বছরগুলোতে রমজান মাসে তিনি একবার কুরআন পাঠ করে শোনাতেন।

১১ হিজরীর সফর মাসের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ সাঃ উহুদ প্রান্তরে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে উহুদের শহীদদের জন্য এমনভাবে দোয়া করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে মসজিদের মিসরের উপরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী। আল্লাহর কসম, আমি এখন আপন হাউজে কাউসার দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজানা সমূহের চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ভয় হয় না যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে। বরং আমার আশংকা হচ্ছে, পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে"

৪৩.১ অসুস্থতার সূচনা

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাসূলুল্লাহ সাঃ একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাকী'তে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামত করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

৪৩.২ শেষ সপ্তাহ

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, ‘আমি আগামী কাল কোথায় থাকব, আমি আগামী কাল কোথায় থাকব?’ —এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, ‘আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবেন।’ বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম সাঃ স্থান পরিবর্তন করে আয়িশার গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফযল বিন আব্বাস রাঃ এবং আলী বিন আবু ত্বালীবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নাবী কারীম সাঃ আয়িশা রাঃ -এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আয়িশা রাঃ সূরাহ নাস ও ফালাক্ এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক মুখস্থকৃত দু‘আ পড়ে নাবী কারীম সাঃ -কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নাবী কারীম সাঃ -এর হাত তাঁর পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ‘আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিতে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম সাঃ -কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই ‘ক্ষান্ত হও’, ‘ক্ষান্ত হও’ বলতে থাকলেন।

সে সময় নাবী কারীম সাঃ-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিস্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ রাঃ আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, ‘ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

তিনি আরও বললেন, "তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ অন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন,

'আমি যদি কারো পিঠে কোড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।'

এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ মিসর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। তারপর আবারও মিসরের উপর আরোহণ করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, 'আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নবী কারীম সাঃ ফযল বিন আব্বাস রাঃ -কে বললেন, 'তাঁকে পরিশোধ করে দাও'। এরপর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

'আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।'

'এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করেছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এক জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।' আবু সাঈদ খুদরী রাঃ -এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবু বকর রাঃ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম। লোকেরা বলল, 'এ বুড়োকে দেখো, রাসূলুল্লাহ সাঃ তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা

বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, যে আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বান্দাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ। আবু বকর রাঃ ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।’

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, 'স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবু বকর রাঃ এবং আমি যদি আপন প্রভু ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকর রাঃ -কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবু বকর রাঃ -এর দরজা ছাড়া।’

ওফাত প্রাপ্তির চার দিনে পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ কঠিন রোগযন্ত্রণার সম্মুখীন হলেন তখন বললেন, 'তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি নোট লিখে দেই যাতে তোমরা আমার পরে কোন দিনই পথভ্রষ্ট হবে না'।

ঐ সময় ঘরে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমার রাঃ, তিনি বললেন, 'আপনার উপর রোগ যন্ত্রণার প্রাধান্য রয়েছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট' এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, 'কাগজ কলম আনা হোক এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ যা বলবেন তা লিখে নেয়া হোক।' অন্যেরা উমার রাঃ -এর মত সমর্থন করলেন। লোকজনদের মধ্যে যখন এভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল তখন নবী কারীম সাঃ বললেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও'।

অতঃপর নবী কারীম সাঃ সে দিনটিতে উপদেশ প্রদান করলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, ইহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিস্কার করবে। দ্বিতীয়টি হল, 'প্রতিনিধিদলের সে ভাবেই আপ্যায়ণ করবে যেমনটি করা হতো।' তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত সেটি ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার উপদেশ, অথবা তা ছিল উসামা রাঃ -এর বাহিনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপদেশ, অথবা তা ছিল 'সালাত' এবং তোমাদের অধীনস্থ অর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাঃ ঐ দিন অর্থাৎ ওফাত প্রাপ্তির চার দিন পূর্বের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকল সালাতেই ইমামত করেন। এ দিবস মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন এবং সূরাহ 'ওয়াল মুরসালাতে উরফা' পাঠ করেন।

কিন্তু এশা সালাতের সময় অসুস্থতা এতই বৃদ্ধি পেল যে, মসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আর তাঁর রইল না। আয়িশা রাঃ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাঃ জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'লোকজনেরা সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানি দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন।'

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একইরূপ করলেন, যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন, অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আবু বকর রাঃ -কে বলে পাঠালেন সালাতে ইমামত করার জন্য। এ প্রেক্ষিতে আবু বকর রাঃ ঐ দিনগুলোতে সালাতে ইমামত করেন। নবী কারীম সাঃ -এর পবিত্র জীবদ্দশায় আবু বকর রাঃ -এর ইমামতে সালাতে সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত। আয়িশা রাঃ তাঁর পিতা আবু বকর রাঃ -এর পরিবর্তে অন্য কারো উপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য নবী কারীম সাঃ -এর নিকট তিন কিংবা চারবার

অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এ অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন তাঁর পিতা সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণের কোন অবকাশ বা সুযোগ না পায়। কিন্তু নবী কারীম সাঃ প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে বললেন, 'তোমরা সকলেই ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গীসাথীদের মতোই হয়ে গিয়েছ। সালাতে ইমামতি করার জন্য আবু বকর রাঃ-কে নির্দেশ দাও।'

জাবির রাঃ বলেন, আমি নবী সাঃ -কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, “তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।” শনিবার কিংবা রবিবারে নবী কারীম সাঃ কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই, দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যুহর সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করেন। সেই সময় সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু 'আনহুম) -এর সালাতের জামাতে ইমামত করছিলেন আবু বকর রাঃ। তিনি নবী কারীম সাঃ -এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে ইশারায় পিছনে আসতে নিষেধ করে সামনেই থাকতে বললেন এবং নিজেকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্যকারীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন। এ প্রেক্ষিতে আবু বকর রাঃ -এর ডান পাশে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর আবু বকর রাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর সালাতের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবীগণ রাঃ -কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন। ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকটে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন।

৪৩.৩ পবিত্র জীবনের শেষদিন

আনাস রাঃ বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবু বকর রাঃ -এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নবী কারীম সাঃ আয়িশা রাঃ -এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ রাঃ -এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবু বকর রাঃ নিজ পায়ে পিছনে ভর

দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন। আনাস রাঃ আরও বর্ণনা করেছেন যে, হঠাৎ নবী কারীম সাঃ সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায় সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল অর্থাৎ নবী কারীম সাঃ -কে তাঁর শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নবী কারীম সাঃ তাঁর কন্যা ফাতিমা রাঃ -কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। আয়িশা রাঃ -এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাতিমা রাঃ বললেন যে, নবী কারীম সাঃ আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নবী কারীম সাঃ -এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাতিমা রাঃ কোন চিন্তা ভাবনা না করেই চিৎকার করে উঠলেন 'হায় আব্বাজানের কষ্ট! নবী কারীম সাঃ বললেন, 'আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।'

নবী কারীম সাঃ হাসান ও হুসাইন রাঃ -কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহবান জানালেন এবং নসীহত করলেন। তিনি আয়িশা রাঃ -কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আয়িশা! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরা সমূহের জীবন কর্তিত

হচ্ছে।’ তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীমত : (তিনি বললেন), ‘আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে। তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখন্ডে আর কখনো এ দু’টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবীগণ রাঃ -কে উপদেশ প্রদান করে বললেন, “সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ” (অর্থাৎ দাসদাসী)!

—এ শব্দগুলো নবী কারীম সাঃ বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

৪৩.৪ ফীর রফীকুল আ'লা

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। আয়িশা রাঃ নবী কারীম সাঃ -কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নবী কারীম সাঃ আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাঃ নবী কারীম সাঃ -এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ সাঃ আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নবী কারীম সাঃ মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাথা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নবী কারীম সাঃ -কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, , 'হ্যাঁ'। আমি মিসওয়াক খানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু' হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন,

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।'

মিসওয়াক থেকে ফারোগ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। আয়িশা রাঃ কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ, রফীকে আ'লা।'

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ সাঃ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা -
- ওয়ালহিক্বনী বির- রফিক্বিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নবী কারীম সাঃ -এর বয়স হয়েছিল তেষটি বছর চার দিন।

৪৩.৫ বিষাদময় দিন

হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দুর্ঘটনার সংবাদ তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীর উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্ত এবং পার্শ্বস্থ সব কিছুই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আনাস রাঃ -এর বর্ণনায়, তিনি বলেছেন যে, “রাসূলুল্লাহ সাঃ যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখি নি।”

নবী কারীম সাঃ -এর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র উমার রাঃ -এর হৃদয় বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, 'কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মুসা বিন ইমরান আঃ গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাঃ ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

এদিকে আবু বকর রাঃ নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর লোকজনদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়িশা রাঃ -এর নিকট গমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর নিকট পৌঁছলেন। নবী কারীম সাঃ -এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। আবু বকর রাঃ পবিত্র মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আল্লাহ আপনার উপর দু'বার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। সে সময় উমার রাঃ লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবু বকর রাঃ তাঁকে বললেন, 'উমার বসো'। উমার রাঃ বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ উমার রাঃ -কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রাঃ -এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবু বকর রাঃ বললেন, 'আল্লাহর প্রশস্তির পর, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাঃ -এর পূজা করেছিল তারা জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ সাঃ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করেছিল, অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মাদ সাঃ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল বিগত হয়ে গেছেন তাতে কি, তবে কি যদি নবী মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা তাঁকে হত্যা

করা হয় তাহলে কি তোমরা তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, স্মরণ রেখো, যারা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেয়া হবে।' [আল 'ইমরান (৩): ১৪৪]

সাহাবায়ে কেরাম রাঃ যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন আবু বকর রাঃ -এর এ ভাষণ শ্রবণের পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর রাঃ যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে ওয়াক্কেফহাল হলেন এবং সকলকেই এ আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।

সাদ্দ বিন মুসাইয়্যিব রাঃ বলেছেন যে, 'উমার রাঃ বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বকর রাঃ -কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করলাম। কারণ, আমি তখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, নবী কারীম সাঃ প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৪৩.৬ কাফন-দাফন

নবী কারীম সাঃ -এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নবী কারীম সাঃ -এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাকীফ বনু সায়েদার মধ্যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবু বকর রাঃ -এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত নবী কারীম সাঃ -এর দেহ মুবারক একটি জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা আবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস নবী কারীম সাঃ -কে কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে তিনবার কুল পাতার মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ বিন থায়সামাহ 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ এই কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি কুরসুফ হতে তৈরী সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

নবী কারীম সাঃ -এর অন্তিমশয্যা সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবু বকর রাঃ বললেন, 'আমি নবী কারীম সাঃ -কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন নবীকে (পৃথিবী) থেকে উঠানো হয়নি তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

এরপর সাহাবীগণ রাঃ পালাক্রমে দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম নবী কারীম সাঃ পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন। সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাত্রে নবী কারীম সাঃ -এর দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। আয়িশা রাঃ বর্ণনা করেছেন যে, 'পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রে মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।'

রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী রাঃ, ফাদল ইবন আব্বাস রাঃ, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান রাঃ। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা রাঃ ইচ্ছে করে তার একটি আংটি

কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ -কে স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন।

দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা রাঃ বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে।' আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন- সবই তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়।

শেষ কথা

যারা আল্লাহর রহমত ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং পৃথিবীতে অশান্তি চায় না, তাদের জন্য রাসূল সাঃ হলেন অনুপম জীবনাদর্শ।

— আদর্শ মানে কী?

— মানুষ যার কথা ও কর্মের অনুসরণ করে, তাকে আদর্শ বলে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ -এর আদর্শের অনুসরণ করা অতীব জরুরি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। আল্লাহর রাসূল সাঃ যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবীরা সেখান থেকেই এক নতুন প্রজন্মের সূচনা করেছেন। সে যুগ ঈমানদীপ্ত জীবনের, সে যুগ

গৌরবের। হাজার বছর পরও আজও লেখকের কলমের কালি ফুরিয়ে যায়নি, মিটে যায়নি নবীর প্রতি ভালোবাসার তৃষ্ণা। তার সম্পর্কে আরও একটু জানার আকাঙ্ক্ষায় আজও আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরি নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি।

তিনিই আমাদের নবীজি ﷺ

পুরো পৃথিবীজুড়ে আমার আপন-পর, কাছের-দূরের, চেনা-অচেনা কত মানুষ! শুধু রাসুলুল্লাহ সাঃ-ই নেই। একজনমাত্র মানুষের অভাববোধই হতদরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সালাম বর্ষিত হোক সায্যিদিনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের প্রতি।

তথ্যসূত্র

১. আর রাহীকুল মাখতুম — আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)
২. সীরাহ মুহাম্মাদ সাঃ — রেইনড্রপস
৩. ইসলামের ইতিহাস — ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
৪. সীরাতে ইবনে হিশাম — মূলঃ ইবনে হিশাম (অনুবাদ আকরাম ফারুক)
৫. <https://www.hadithbd.com/>
৬. যেমন ছিলেন তিনি — শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনায্জিদ

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111571307>